গদ্যকোরক

BANGLADARSHAN.COM

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
নাম বিভ্রাট	৪
উৎপাতের কড়ি চিৎপাতে	৫
ফিরে পাওয়া	৭
বিস্মৃতি	৮
শিকল ভাঙা	৯
দূরত্ব	১২
পুনর্জন্ম	১৫
ইনটিউশন	১৭
নজর দেওয়া	২২
রিফান্ড	২৩
সময়ের প্রতিশোধ	২৭
বরদান	৩২
সুর দিয়ে ছোঁয়া	৩৫
লোভের মরণ	৩৮
বন্ধুত্ব	৪১
প্রার্থনা	৪৪
মিলন	৪৫
রুদ্রাক্ষের মালা	৪৭
অন্ন বিনিময়	৪৯
অভাবনীয় প্রাপ্তি	৫০
আলিঙ্গন	৫১
আলো দেওয়া	৫২
আধ জানন্তী	৫৫
সুই লেনা	৫৭
বৈতরণী পার	৫৯
সাফল্য	৬০
সেলুকাস	৬১
অণুসন্ধান	৬২
রক্ষক	৬৩
অন্তরায়	৬৪
পঞ্চানন	৬৫

BANGLADARSHAN.COM

॥নাম বিভ্রাট॥

বাড়ির বড়ছেলের নাম হুলো। বাড়িতে ঘুরে বেড়ায় বেড়াল, সর্বত্র গতিবিধি। প্রাচীনপন্থী বাড়িতে গুরুজনদের নাম নিলে বৌয়েদের শাশুড়ির কাছে কথা শুনতে হয়, খাওয়ার সময় রুষ্ট শাশুড়ি পাতের ধারে বসিয়ে দেন একবাটি দুধ প্রায়শ্চিত্তের।

সেজভাইয়ের বৌ দীপ্তি সিঁড়ির দালানে ছেলেকে খাওয়াচ্ছে, ছেলে খাওয়া নিয়ে জ্বালাচ্ছে, এমন সময় সিঁড়ির মুখে এল বাড়ির হুলো বেড়ালটা। দীপ্তি ছেলেকে বলল, “শিগগির খা, ওই দেখ হুলো, ও খেয়ে নেবে কিন্তু।”

দীপ্তির দুপুরে খাওয়ার সময় শাশুড়ি একবাটি দুধ ঠক করে বসিয়ে ঝংকার দিলেন, “বুঝেসুঝে কথা বোলো, গুরুজনদের নাম নেওয়া বন্ধ করো।” দীপ্তি বলল, “কিন্তু আমি তো বেড়ালের কথা বলেছিলাম!!” শাশুড়ি বললেন, “সেটা ভাসুরেরও নাম।” দীপ্তি হতবাক।

BANGLADARSHAN.COM

॥উৎপাতের কড়ি চিৎপাতে॥

প্রবাদ মেঘ না :প্রবচন-চাইতেই জল, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, পথেও হাগবো চোখও রাঙাবো, মামারবাড়ির আবদার, বুনো ওল বাঘা তেঁতুল, উৎপাতের কড়ি চিৎপাতে যায়, মুখে কুলুপ আঁটা।

সেতারটার জোয়ারি করাতে নিয়ে যেতে হবে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল অর্পণ, একেবারে 'মেঘ না চাইতেই জল। যেতে হবে বেহালা থেকে যোধপুর পার্কে, বেলা দশটা বাজে। যন্ত্রটা সঙ্গে আছে বলেই ট্যাক্সি নিল ও। বিহারি ট্যাক্সিওলাকে ভাড়া জিজ্ঞেস করতে সে বলল "আড়াইশো দেবেন।" অর্পণ বলল, "ওটা দুশো করো।" সে "হবে না" বলে ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে অর্পণ আড়াইশোতেই রাজী হয়ে ট্যাক্সিতে উঠলো। একটু এগিয়ে ক্রসিংয়ে ট্রাফিক সার্জেন্ট মাঝরাস্তায় প্যাসেঞ্জার তোলার জন্য দুশো টাকার কেস দিল ট্যাক্সিওলাকে....'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।'

ট্যাক্সিওলা অর্পণকে বলল, "যান না, গিয়ে একটু কথা বলুন, যদি আপনার কথায় কিছু করে, আপনার জন্যই তো কেস খেলাম।" অর্পণ ভাবলো...বারে...'পথেও হাগবো চোখও রাঙাবো'...ভারী মজা তো!!! অর্পণের তার আগে পর্যন্ত খারাপ লাগছিলো ট্যাক্সিওলাটার জন্য, এখন ওর কথা শুনে মাথাটা গরম হয়ে গেল। ও চুপচাপ সিটে হেলান দিয়ে বসে থেকে বলল, "তুমি আমার জন্য কেস খেয়েছো নাকি? যেখানে দাঁড়ানোর কথা নয় সেখানে দাঁড়িয়ে লোক তুলেছো বলে কেস খেয়েছো।" ট্যাক্সিওলা গজগজ করতে করতে গিয়ে সার্জেন্টকে দুশো টাকা দিয়ে এসে ট্যাক্সিতে বসে বলল অর্পণকে, "আপনি আমাকে আরো একশো টাকা বেশী দেবেন, মানে সাড়ে তিনশো।"

অর্পণ এবারে বললো, "আর একটা পয়সা বেশী দেব না তোমাকে, 'মামারবাড়ির আবদার' আর কী!!! সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে আছে, বেশি ঝামেলা করলে আমি সার্জেন্টকে গিয়ে বলছি এবারে। তুমি 'যেমন বুনো ওল আমিও তেমনি বাঘা তেঁতুল।" বেগতিক দেখে ট্যাক্সিওলা ট্যাক্সিতে স্টার্ট দিয়ে চালাতে লাগলো।

যোধপুর পার্ক পোষ্ট অফিসের কাছে এসে যখন ও নেমে ভাড়া দিচ্ছে তখন আবার ট্যাক্সিওলা ওকে ওই সার্জেন্টের কেসের জন্য আরো পঞ্চাশ টাকা বেশী দেওয়ার কথা বলাতে ও জিজ্ঞেস করল, "বেহালা থেকে যোধপুর পার্ক তোমাদের মিটারে কত ভাড়া হয়?" ট্যাক্সিওলা বলল, "ওই দেড়শো থেকে একশো ষাটের মত হয়।" অর্পণ বলল, "জান তো, 'উৎপাতের কড়ি চিৎপাতে যায়' বলে একটা প্রবাদ আছে বাংলায়, তুমি 'দিনে

ডাকাতি’ করে বেশী ভাড়া নিচ্ছ, এখন তার ওপরে আবার পঞ্চাশ টাকা বেশী চাইছো? বেশ হয়েছে সার্জেন্ট কেস দিয়েছে তোমাকে।” ট্যাক্সিওলার মুখে এবারে ‘কুলুপ আঁটা।’

BANGLADARSHAN.COM

॥ফিরে পাওয়া॥

অবনী ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাত্রে ফিরল না দেখে খারাপ কিছুর আশঙ্কায় পুলিশে খবর দিল ছেলে সুজয়। পুলিশ পরেরদিন সন্ধেবেলায় ডেকে পাঠালো ওকে থানায় লাশ সনাক্ত করতে যেটা রানওভার হয়েছে জাতীয় সড়কের ওপরে। লাশের পকেট থেকে অবনীর মোবাইল, পার্স আর চেকবই মিলেছে দেখে সুজয় নিশ্চিত হোল ওটা অবনী বলে। বাবাকে এইভাবে হঠাৎ হারাবার শোকে কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে ঢুকে দেখে সুজয় বাবা ঘরে বসে চা খাচ্ছে। হতভম্ব সুজয়কে অবনী জানালো তার আগেরদিন ট্রেনে পকেটমার হয়ে যায় মোবাইল, পার্স আর চেকবই। তাই রাত্রে ফিরতে পারেনি অবনী বাড়িতে, এমন ঘটনায় সুজয় অবনীকে ফেরত পাবার আনন্দে আবার কেঁদে ফেলল বাবাকে জড়িয়ে ধরে।

BANGLADARSHAN.COM

॥বিস্মৃতি॥

নীচের মেজানাইনের ঘরে সেতারের রেওয়াজ করছে অপু, দোতলায় মা থাকেন, আড়াইতলার মেজানাইনের ঘরে অপুর বৌ, মেয়ে থাকে, তিনতলার পুরোটায় থাকে অপুর ভাই রাজ সপরিবারে। শীতের রাতে রাত আড়াইটেয় অপুর মা দরজা খুলে চেঁচামেচি আরম্ভ করলেন, "রাত্রে কেউ আমাকে খেতে দেয়নি, সবাই না খাইয়ে মারার মতলব করেছে। ছেলেরা আর বৌয়েরা আমারই বাড়িতে থেকে আমাকেই খেতে দেয় না। কালই আমি বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চলে যাব অন্যত্র। ছোটছেলে ভাড়াটেদের বাড়ি ভাড়া নেবে অথচ খেতে দেবে না, কী ভেবেছে সবাই এরা? না খাইয়ে মারবে আমাকে? খিদের তাড়নায় আমার ঘুম আসছে না!!!" পরিত্রাহি চেঁচিয়ে যাচ্ছেন তিনি, বাড়িতে সবাই ঘুমোচ্ছে একমাত্র অপু ছাড়া। কিছুক্ষন পরে তার কানে চিৎকার ঢুকতেই সে উঠে এসে জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে মা?" অপুর মা একদম কেঁদে ফেললেন, "আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে, রাত্রে কেউ আমাকে খেতে দেয়নি, ভুলে গেছে খেতে দিতে।" বলে কাঁদতে লাগলেন অপু তাকিয়ে দেখলো রাত্রের খাবারের দুধের বাটি, প্লেট সব টেবিলে রয়েছে। সেগুলো খালি।

BANGLADARSHAN.COM

পঁচাশি বছরের অপুর মা সব ভুলে যান আজ কয়েক বছর যাবৎ, একঘন্টা আগের ঘটনাও তার মনে থাকেনা, মনে থাকে তার ছোটবেলার কথা, ছেলেদের অল্পবয়সের কথা, নিজের সংসার করার সময়ের ঘটনা। বয়সেজনিত এক অদ্ভুত বিস্মৃতির স্বীকার তিনি।

অপু প্রথমে দেখালো যে খাবারের এঁটো বাসন পড়ে আছে, উনি সমানে বলে যাচ্ছেন ওগুলো সকালের খাওয়ার বাসন আর কেঁদে যাচ্ছেন। অপু ওপরে নিজের ঘরে এসে বৌকে ডেকে তুললো, সে উঠে আটটা বিস্কুট, একগ্লাস গরম দুধ আর চারটে মিষ্টি দিল, অপু গিয়ে সেগুলো দিতে একচুমুক দুধ খেলেন, দুটো বিস্কুট আর একটা মিষ্টি খেয়ে বললেন, "আর খেতে পারছি না, এখন মনে হচ্ছে আগে বোধহয় খেয়েছিলাম রাত্রে জানিস।" বলে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। অপু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলো বিস্মৃতির কী কষ্ট, খাবার খেয়েও ভুলে যায় মানুষ!!!!

॥শিকল ভাঙা॥

বাবলার যখন সাড়ে ছয়, তখন বুবলা হল সুমিতার। বুবলার জন্মের সময় সুমিতার তিন তিনবার ব্লিডিং শুরু হয়ে গেছিল, শেষের পাঁচমাস একদম বিছানায় শুইয়ে রেখেছিলো ডাক্তার সুমিতাকে। আসলে বাবলার সময়েও ছিল জটিলতা ওর, সেইসময় পুরোটাই ও শুয়ে থেকেছে বাপের বাড়িতে, বুবলার সময় সেটা সম্ভব হয়নি বাবলার স্কুল, ওর দেখভাল করতে গিয়ে। বাবলা একেবারে মায়ের সুপুত্তুর কিন্তু নিজেও যেহেতু প্রচুর মার খায়, সেটা উশুল করে ভাইয়ের ওপর দিয়ে। এদিকে বুবলা ছোট থেকে রুগ্ন, তাই সুমিতার বর অর্পণের চোখে যখনি পড়ে বাবলার বুবলাকে শাসন, সে রুখে দাঁড়ায়। এই নিয়ে বাবলার সঙ্গে বিরোধ বাড়ে দিনে দিনে। বাবলা ক্রমে বোঝে বাবাকেও চটানো যাবে না কারণ ওদের বড়ো ডুয়াল ফ্ল্যাট, দুটো গাড়ি, যখন তখন বেড়ানো, বিরাট স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং ওই বাবার দেখতায়। বাবলা বুদ্ধিমান কিন্তু স্বার্থপরও, ক্লাস সিক্স থেকে তাই ও হয়ে যায় বাপ কা বেটা কিন্তু মাকে একদম গার্ড করে করে রাখে। আসলে অর্পণকে হাতে না রাখলে ওর স্বপ্নগুলো সাকার হবে কী ভাবে? বাবা মানে এটিএম কার্ড,তাই বুবলার ওপরে ওর জোর খাটানো বা শাসন এখন চলে চোরাগোপ্তায়, অর্পণের চোখের আড়ালে। বুবলা দাদার মার, মায়ের শাসন নিয়ে নিজেকে গুটিয়ে রেখে চলে।

BANGLADARPHAN.COM

দেখতে দেখতে বাবলা বড়ো হল, ইঞ্জিনিয়ার হল মেধার জোরে ততটা নয়, যতটা বাপের পয়সার জোরে। প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে অর্পণের অফিসেই ঢুকলো বাবলা, বাবার সাথেই অফিসে যায় বাবার জাইলো ড্রাইভ করে। বুবলাও দেখতে দেখতে স্কুলের গন্ডি পেরোল। কিন্তু তার পড়াশোনা নিয়ন্ত্রণ করে তার মা আর দাদা। তার যে আলাদা একটা ব্যক্তিত্ব আছে, সে যে আলাদা একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ, বুবলার মা সুমিতা আর বাবলার যেন খেয়ালই থাকে না। বুবলার স্বাতন্ত্র বোঝা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে, সে একগাদা খেতে পারেনা দাদার মত, তার অসম্ভব শখ ফোটোগ্রাফির আর সে ভীষণ চুপচাপ, ছোট থেকে বাড়ির আর সকলের চড়া ব্যক্তিত্বের কাছে সে নিষ্প্রভই ছিল, তাই সে ভীষণ গুটিয়ে রাখে নিজেকে। মনে মনে মুক্তির রাস্তা হাতড়াতে থাকে।

কিন্তু স্ট্রিম বাছতে গিয়ে মা-দাদার সঙ্গে তার সংঘাতটা প্রবল হয়েই গেল। সেও ফোটোগ্রাফি নিয়ে পড়বে আর ওরা চাইছে সেও ইঞ্জিনিয়ার হয়। ওর অনমনীয় মনোভাব দেখে বাবলা অর্পণকেও দলে নিল এই বলে মানিয়ে যে ফোটোগ্রাফির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে অন্ততঃ চাকরিটা পাবে। বুবলার একমাত্র পৃষ্ঠবল বাবা যখন বেঁকে বসলো, ওকে রাজী হতে হল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে, পড়ল সেই বাবার পয়সার জোরেই, মেধার জোরে নয়।

বুবলার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সেকেন্ড ইয়ারে বাবলা পাড়ি দিল জার্মানিতে ডাটা সায়েন্স নিয়ে আরো পড়বে বলে নিজের জমানো টাকায়, কিন্তু ওখানে পৌঁছে দেখা গেল ওর আরো টাকা লাগবে যেটা অর্পণ না দিলে ওর ওখানে থাকাই অসম্ভব। প্রথমে বাবলা মাকে রাজী করালো মায়ের বুটিকের ব্যবসা বিক্রি করাতে, সুমিতার

সাধের বুটিক বিক্রি হয়ে গেল বাবলার জার্মানির পড়ার খরচ জোগাতে, তারপরে অর্পণকে চাপ দিতে লাগলো আরো টাকার জন্য, মাসে পঞ্চাশ হাজার। ওর তখনো আরো চারবছর থাকতে হবে। মাকে দিয়ে রোজ রোজ এই চাপটা ও দিতে লাগলো ওখান থেকে। এদিকে অর্পণ নিজের সফটওয়্যারের নতুন কোম্পানি খুলেছে, তারও টাকার প্রয়োজন। এই নিয়ে বাড়িতে ক্রমাগত অশান্তি হচ্ছে, এদিকে দেখতে দেখতে বুবলা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করল, ক্যাম্পাসিংয়ে চাকরিও পেল সোজা ব্যাঙ্গালোরে। বাবলা কিন্তু ফিরলো না আর দেশে, ওখানেই থেকে গেল আর বুবলাকে চালানোর জন্য মাকে চাপ দিতে লাগলো।

বুবলা চাকরি পেয়ে এবারে কারুর সঙ্গে পরামর্শ করল না, জয়েন করার নির্দিষ্ট দিনের আগে টিকিট বুকিং করে ও বাবা মাকে বলল ওর চাকরির কথা।মা প্রবল আপত্তি করল, সঙ্গে সঙ্গে বাবলাকে ফোন করল। বাবলা ওকে বারণ করল নিজের শহরের বাইরে গিয়ে চাকরি করতে, ভয় দেখালো এর ফল ভালো হবে না, ওকে ঠকতে হবে কিন্তু বুবলাও অনড়, এই প্রথম ও সবার বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের সিদ্ধান্তে ঘর ছাড়লো। এই বাড়ির থেকে ওর মুক্তি চাই, চিন্তার মুক্তি, নিজের শখের মুক্তি, নিজের আত্মার মুক্তি। এখানে থাকলে এদের অঙ্গুলিহেলনে চলতে চলতে ওর জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। ব্যাঙ্গালোরে ওর প্রথমে অসুবিধে হলেও ও ঠিক মানিয়ে নেবে তাই ওখানে জয়েন করে ও ভর্তি হল ওর ফোটোগ্রাফির কোর্সে, শিখতে লাগলো ফটোগ্রাফি বাড়িতে না জানিয়ে, মা বাবাকে মাসে মাসে টাকাও পাঠাতে লাগলো। মাবাবা খুশি টাকা পেয়ে, ওদের আর্থিক সাহায্য হচ্ছে বৈকি।

BANGLADARSHAN.COM

এরমধ্যে ওকে ওর অফিস থেকে পাঠালো লন্ডনে এসাইনমেন্ট দিয়ে অনসাইটে। ও পাড়ি দিল লন্ডনে, যাবার আগে মাবাবা অনেকবার বলল বাড়িতে আসতে, ও গেল না। লন্ডনে গিয়ে সেখানে একটু থিতু হয়ে খোঁজখবর করে ওর তোলা ছবি পাঠাতে লাগলো বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়। একদিন ওর ছবি মনোনীত হল ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে। ওদের জার্নালে ছাপালো ওর ছবি।

ও সেই ছাপানো ছবির জার্নালের কপি পাঠালো এবারে মা বাবা আর দাদাকে। মা প্রথমে রেগে গেল ওদের না জানিয়ে এসব করার কারণে যেহেতু মা আর ওকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। কিন্তু বাবা খুব খুশি হল,বাবা জানালো বাবারও একসময় খুব ফোটোগ্রাফির শখ ছিল। এতদিনে মা বাবা দুজনেই দুঃখিত হল ওকে ওর ইচ্ছে পূরণ করতে না দেওয়ার জন্য আর বাবলা রেগে গেল ওকে না জানিয়ে এবারেও বুবলা নিজের ইচ্ছেতে এসব করেছে দেখে। বাবলা লন্ডনে এলো ওকে শাসাতে, বুবলা বাবলার সাথে দেখা করল গিয়ে বাবলার হোটেলে, নিজের বাড়ির ঠিকানা দিল না, বাবলার কথা শুনলো চুপচাপ, তারপরে বাবলাকে বলল, “ঠিক কত টাকা চাই তোর দাদা?” বাবলা রেগে গিয়ে হাত তুললো মারবে বলে, বুবলা হেসে বলল, “আমি এখন সাবালক আর স্বনির্ভর, আমার ব্যাপারে মাথা গলাস না, নিজের চরকায় তেল দে।” বাবলা বুঝলো বুবলার ওপরে আর জোর খাটানো যাবে না, ও নিস্ফল আক্রোশে জ্বলতে জ্বলতে ফিরে গেল জার্মানিতে।

বুবলা নির্বিকার, ও এখন মুক্ত বিহঙ্গ, আর ও ওই শিকলে জড়াবে না...আর কারুর তোয়াক্কা ও করেনা....ও পেয়ে গেছে ওর মুক্তির স্বাদ....ওর নিজের মত করে কিছু করার, করে দেখিয়ে এগিয়ে চলার রাস্তা, ওকে আর

দাদার বা বাবা মায়ের মুখাপেক্ষী হতে হবে না, ওদের টাকা চাই সেটা ও দিয়ে দেবে কিন্তু এই জীবন থেকে আর ফিরবে না ওই বদ্ধ পরিসরে ওদের মাঝখানে।

BANGLADARSHAN.COM

॥দূরত্ব॥

দুইভাই আর একবোন নিয়ে অর্চকদের বাড়ি, অর্চকদের সোনার ব্যবসা, নিজেদের দোকান, বিরাট বড়োলোক ওরা। কিন্তু অর্চকের মা হচ্ছে অর্চকের ভাষায় “পুরো হিটলার।” অর্চক পড়ে ডন বসকোতে, পড়াশোনায় খুব মেধাবী, কিন্তু মায়ের জন্য ওর জীবন অতিষ্ট। টিউশনে যাবে সেখানে মা আনতে যাবে আর সবাইকে শোনাবে ওর মা যে কত কষ্ট করে ওকে মানুষ করছে। আরে বাবা...সব মায়েরাই তো তাই করে!!!

তাছাড়া অর্চকের একটা ভীষণ পছন্দের বিষয় হল ওয়েস্টার্ন ডান্স, ও নিজের পকেটমানি থেকে ফিজ দিয়ে ডান্স স্কুলে ভর্তি হয়েছে শিখতে। হিপহপ, সালসা, ব্যালে, ব্রেকডান্স এইসব ডান্সফর্ম, কিন্তু বাড়িতে জানাতে পারেনি, জানালে আর রক্ষে নেই। একদিন টিউশনের এক বন্ধুর চোখে পড়ে গেল, তাকে হাতে পায়ে ধরে রাজী করালো ওর মাকে যেন না বলে দেয়। টিউশনের প্রজ্ঞা বলে মেয়েটা ওকে পছন্দ করে, সেও পড়ে লোরেটোতে, কিভাবে যেন মা বুঝতে পেরে গেল ওই পছন্দ করার ব্যাপারটা, সোজা সেই প্রজ্ঞার বাড়িতে গিয়ে প্রজ্ঞার মাকে প্রজ্ঞার নামে “ছেলেধরা মেয়ে” বলে যাতা বলে এলো। প্রজ্ঞার- মাও খুব রেগে গিয়ে যাচ্ছেতাই বলল ওর মাকে, হয়ে গেল পছন্দ করার ইতি। দেখতে দেখতে আই সি এস ই পাশ করল নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট মার্কস নিয়ে অর্চক কিন্তু ওর মা ওকে ডন বসকোতে রাখলো না। এখানে বন্ধুদের সঙ্গে থেকে ওর পড়াশোনা হবে না বলে, পাঠিয়ে দিল রাজস্থানের কোটায় ওকে পড়তে, ওখানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্পেশাল কোচিং দেবে, তাই ওকে ওখানেই পড়তে হবে। ওর কান্নাকাটি, আবেদন নিবেদনে কোনো ফল হল না, ওকে যেতেই হল। ঠিক তিনমাসের মাথায় ওর ওখানে এমন নার্ভাস ব্রেকডাউন হল, হাতের শিরা কাটলো ও এমনভাবে যে অর্চকের বাড়িতে ফোন গেল ওদের কলেজ থেকে। ওকে হসপিটালে ভর্তি করতে হল ওখানে, ডাক্তারের পরামর্শে বাধ্য হয়ে ওকে ফিরিয়ে আনলো মা বাবা। এখানে এনে ডনবসকোতে আবার কথা বলে ওকে ভর্তি করল ওখানে। অর্চক আই এস সি পাশ করল ভালোভাবে, আবার আই আই টিতে চান্স পেল, যাদবপুরেও চান্স পেল। অর্চক ভর্তি হল আই আই টি খড়গপুরে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে।

অর্চক ভাবলো এবারে ও বেরোল বুঝি মায়ের মুঠো থেকে। কিন্তু মা ওখানে ওর রুমমেট আর ক্লাসমেটদের খাইয়ে বশ করল শুধু মাত্র ওর ওপরে নজর রাখবে বলে। ও কোনো নিজের ক্লাসের মেয়ের সঙ্গে কথা বললেও সেটা ওর মায়ের কাছে খবর চলে যায়। অর্চক ফাঁক খুঁজতে লাগলো মায়ের হাত থেকে রেহাই পাবার। এদিকে ওর ওপরে নজর রাখার জন্য আলাদা একটা ফোন মা ওর রুমমেট সুরজকে প্রেসেন্ট করে বসলো। অর্চকদের পরিবার যেহেতু বড়োলোক ওর চারটে দামী মোবাইল, যার দুটো আইফোন, দুটো আইপ্যাড এপলের, যে ল্যাপটপ ক্লাসে নিয়ে যায় ও সেটাও এপল কোম্পানির, ব্র্যান্ডেড জুতো, জামা ছাড়া মা কেনে না। কিন্তু খড়গপুরে গিয়েও ঠিক খুঁজে খুঁজে বের করে ফেলল অর্চক সেই ডান্স ক্লাস, মায়ের যোগ্য ছেলেই বটে। এবারে সুবিধে হল ও অনলাইনে শিখতে লাগলো, ক্যাম্পাসে একটু আলাদা থেকে স্টেপস তুলতে লাগলো। দেখতে দেখতে ফাইনাল ইয়ার হয়ে ওদের ক্যাম্পাসিং চলছে যখন ও প্রফেসরদের সঙ্গে কথা বলে এম টেক করতে লাগলো ওখানে। এম টেক করে পিএইচডি করতে করতে চাকরি পেল এম আই টিতে পড়ানোর আর এখানে আই আই টিও ওকে অফার দিল পড়ানোর। ও চুপচাপ এম আই টির অফারটা নিল, বাড়িতে জানালো না

তখনই।

এম আই টিতে জয়েনিং এর এক সপ্তাহ আগে বাড়িতে জানালো, বাড়িতে রীতিমতো ঝড় উঠলো। অর্চক কিছু বলার আগে এবারে ওর বাবা ওর মাকে বোঝাতে বসলো, ওর দাদা যে এখন ওদের ব্যবসাটা সামলায় সেও বোঝালো এমন সুযোগ সবাই পায় না, খড়গপুরের প্রফেসরদের সঙ্গেও মা কথা বলল, তারাও বললেন ওখানকার অত ছাত্রের মধ্যে মাত্র ছয়জন পেয়েছে এই সুযোগ। অর্চক তো যেতে চাইছে মায়ের হাতের বাইরে চলে যেতে পারবে বলে। সবার চাপাচাপিতে মাকে রাজী হতেই হল। অর্চক পাড়ি দিল আমেরিকার ম্যাসাচুসেটে। ওখানে গিয়ে অপার মুক্তির স্বাদ পেল ও, এখন থেকে ও স্বাধীন, যা খুশি করতে পারে, কেউ খবরদারি করার নেই। ও ওখানকার চাকরির পাশে ডান্স স্কুল থেকে কোর্স করল, আলাপ হল তানিয়ার সাথে, সেও ডাক্তার কিন্তু নাচ শেখে ওর স্কুলে। ওরা নাম দিল "আমেরিকা গট ট্যালেন্ট শো"তে, আস্তে আস্তে ও আর তানিয়া নাচের জন্যও পরিচিতি পেল ওখানে। তানিয়ার বাবা অর্চকের মায়ের পুরুষ সংস্করণ।

অর্চক বেড়াতে খুব ভালোবাসে,মাঝে মাঝে আসে মুম্বাই বা দিল্লি তানিয়াকে নিয়ে, ওখান থেকে লাদাখ, চোপতা ভ্যালি, অরুণাচল ঘুরে যায়, কিন্তু পুরোটাই বাড়িতে না জানিয়ে, দুজনের কেউই বাড়িতে জানায় না। একবার যে স্বাধীনতার স্বাদ ওরা পেয়েছে সেটা কোনো মূল্যে আর খোয়াতে চায় না ওরা। অর্চক বোঝে মায়ের ভীষণ আক্ষেপ ওর রোজের কাজকর্ম মা জানতে পারছে না বলে, এখানে মাবাবা আসতে চাইলেই অর্চক বলে দেয় ওর ইউনিভার্সিটি থেকে ওকে অন্য জায়গার ইউনিভার্সিটিতে পাঠাচ্ছে পেপার পড়তে। এবারে ও পাড়ি দিল সুইজারল্যান্ড, তানিয়াও জয়েন করল ওখানকার হাসপাতালে, ওখানে গিয়ে এম আই টির চাকরিটা ছাড়লো অর্চক, ওখানে ওখানকার ইউনিভার্সিটিতে একটা পড়ানোর চাকরি নিল আর নিজের ডান্স স্কুল খুলল। বাড়ির সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করল শুধু মায়ের ওই শাসনের ঘেরাটোপ থেকে বেরোবার জন্য, বাবাকে একমাত্র চুপিচুপি জানিয়ে রাখলো ওর বর্তমান অবস্থান, যতই হোক শেকড়টা যে এখানেই।

প্রফেসর এবং ডান্স টিচার হিসেবে নাম হল ওর, ও ওয়েস্টার্ন ডান্স নিয়ে রিসার্চ করল এবং তার জন্য ওদেশে স্বীকৃতি পেল। মাঝে একবার এলো দেশে, মা বিয়ে বিয়ে করে মাথা খেতে আরম্ভ করতে ও প্রথমে বলল ও বিয়ে করবে না কিন্তু মা অনর্থক জেদাজেদী আরম্ভ করতে ও ওর তানিয়ার ছবি দেখিয়ে বলে দিল ও ওই মেয়েটির সঙ্গে লিভ ইনে আছে, মা একদম হিস্টিরিয়া রুগীর মত আরম্ভ করলে ও বলল ও তানিয়াকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছে। মা হাল ছাড়তে বাধ্য হল, কিন্তু বাবাকে জানালো ও যে বিয়ে ও করবেই না আর কারুর সঙ্গে সম্পর্কেও যাবে না, তাহলে আরেকটা মায়ের মত মেয়ের ইচ্ছেতে ওকে চলতে হবে, মায়ের এই আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে সবকিছুতে খবরদারি আর ওর পক্ষে মেনে চলা সম্ভব নয়। বাবা কিছুক্ষন চুপ করে থেকে ওর কাঁধে একটা আশ্বাসের হাত রাখলেন, তিনিও বিয়ের পর থেকে যে নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছে বিসর্জন দিয়েছেন সংসারে শান্তি রক্ষার স্বার্থে, তাই ছেলেকে খুব জোর করতে পারলেন না। অর্চক আর কোনো মূল্যেই ওর স্বাধীনতা খোয়াবে না, দেখতে দেখতে ওর ফেরার দিন এগিয়ে এলো। ও শেষবারের মত মাকে বিদায় জানিয়ে ফ্লাইট ধরল ফেরার, মনখারাপ হলেও স্বাধীনতার জন্য এটুকু মূল্য তো দিতেই হবে।

অতিরিক্ত খবরদারিতে যে মা বাবারা ছেলেমেয়েদের থেকে দূরে সরে যায় আবার সেটা অর্চক আর তানিয়া- নিজেদের জীবন দিয়ে বুঝলো, তাবলে কী অর্চক ওর মাকে ভালোবাসেনি বা অর্চকের মা ওকে কম ভালোবাসে? না, অর্চক ওর নিজের মত করে মাকে ভালোবেসেছে যেটা ওর মা বুঝতেই পারেনি আর ওর মাও ওকে ভালোবেসেছেন নিজের শর্তে কিন্তু ছেলের মন বোঝার চেষ্টা করেননি। ওর মতামত, পছন্দ অপছন্দের গুরুত্ব দেননি, ওর জীবনটা নিজের ইচ্ছেয় চালাতে চেয়েছেন, নিজের ইচ্ছেগুলো সব কিছু চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন। তানিয়ার আর ওর বাবার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। তাই এই দূরত্বটা দিন দিন বাড়তে বাড়তে শেষে একদম বহুদূরেরই হয়ে গেল ওরা।

BANGLADARSHAN.COM

॥পুনর্জন্ম॥

আমি বেহালার মুখার্জি বাড়ির মেজছেলের বৌ অনিন্দিতা। আমার বাড়িতে আমার গৃহসহায়িকা ছিল বাসন্তী মন্ডল, আসে সেই পৈলান থেকে, ওদের ভাষায় পৈলেন। বেঁটে, মোটা, কালো বাসন্তীর ছিল ভীষণ কামাই, মাসের মধ্যে দশদিন তো নিশ্চয়ই, আরো বেশীও হত। কিন্তু বাসন্তীর কাজ খুব পরিষ্কার, খুব টেনে করে ও যখন কাজে আসে, দরকারে অদরকারে ওর বাঁধা কাজের বাইরে কোনো বেশী কাজের দরকার পড়লে বাসন্তী না বলে না আর বাসন্তীর মুখ নেই, ঝগড়ুটে নয় মোটেই, মানুষটা হাসিখুশি, ঠান্ডা। নয় নয় করে আমার বাড়িতেই বাসন্তী কাজ করছে বছর দশেক।

বাসন্তীর দুই মেয়ে আর এক ছেলে, বাসন্তীর বর সুবল হচ্ছে ওর কাছে উত্তমকুমার, তার তিনটে বিয়ে কিন্তু আগুন সাক্ষী করে সেই সুবলের জন্য বাসন্তীকেই দেখে শুনে ঘরে তুলেছিল বাসন্তীর শ্বশুর শাশুড়ি, তাই আর দুই বৌ দুয়োরের চৌকাঠ পেরোতে পারেনিএসব বৃত্তান্ত বাসন্তীর কাছেই শোনা। সুবল আমাদের পাড়ায় রিক্সা চালায় আর এদিকে ওদিকে একটু মুখ পাল্টানোর চেষ্টা করে। প্রায়ই বাসন্তী কাজে এসে অনেক কথা বলে ওর বরের নামে।

BANGLADARCHANI.COM

এরমধ্যে ওর ছোটমেয়ের বিয়ের ঠিক হলো, আমাকে বলল সাহায্য করতে, আমি, শাড়ি, কয়েকহাজার টাকা দিলাম, একটা বড়ো পেতলের থালা, দুটো বাটি আর গ্লাস আর একটা বোম্বে ডায়িংএর বিছানার চাদরের সেট দিলাম। বিয়ের কয়েকদিন আগে বাসন্তী এসে বলল ওর পরিচিত একজন বিদ্যাসাগর হাসপাতালে মেয়েকে দেখাতে এসেছে পেটের ব্যথা বলে, ডাক্তার বলেছে আপেন্ডিক্স, এখুনি অপারেশন করতে হবে, মেয়ের পায়ের একজোড়া তোড়া বেচে টাকা চাইছে, আমি নেব কিনা। আমি নেব না বলতে বাসন্তী বলল ও নেবে হাজার টাকায় ওই তোড়াটা কিন্তু আপাতত টাকাটা আমি যেন দিয়ে দিই, ও পরে শোধ করে দেবে, ওই তোড়া পালিশ করে ও ওর মেয়েকে দেবে। আমি দিয়ে দিলাম টাকাটা। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল।

এবারে ওর বর ওর আঠারো বছরের ছেলের বিয়ে ঠিক করে এলো, সেই নিয়ে ছেলের সঙ্গে, বাসন্তীর সঙ্গে অশান্তি হচ্ছে এমন সময় বাসন্তীর ডায়েরিয়া হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হল, পনেরোদিন পরে যেদিন বাসন্তী এলো সেদিনও বেচারী ধুঁকছে। আমার বাড়িতে কাজ করছে, আমি বকুনি দিচ্ছি, এমন সময় বেল বাজলো সদর দরজার। আমার কত্তামশাই খুলে একটু পরে এসে বলল বাসন্তীর বর এসেছে ওর মাইনের টাকা নিতে, বলছে বাসন্তী আসতে পারবে না, ওর হাতে যেন টাকাটা দিয়ে দিই। বাসন্তী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে গিয়ে উঠেছিল ওর দিদির বাড়িতে চৌরাস্তায়, সেখান থেকেই কাজে এসেছে। ওর বর জানেনা বাসন্তী ছাড়া পেয়ে কাজে এসেছে। আমার কত্তা যেই বলেছে একথা যে ওর বর এসে ওর মাইনের টাকা চাইছে, বাসন্তী “চলো তো দাদা, দেখি ও কার টাকা নিতে এসেছে” বলে আমার কত্তার আগে আগে নেমে গেছে নিচে, ওকে দেখে ওর বর একদম ভূত দেখার মত আঁতকে উঠে হাঁটা লাগিয়েছে। আমরা খুব হাসছি বাড়িতে তখন সবাই। আমার বাড়িতে ছাড়াও এক বৃদ্ধা মাসিমার বাড়িতে বাসন্তী কাজ করতো, তিনি ভীষণ শুচিবায়ুগ্রস্ত, তাই তার

ছেলে মেয়েরা সবাই অন্য জায়গায় বাড়ি করে চলে গেছে, উনি মেসোমশাইয়ের পেনশনের ভরসায় আর বাসন্তীর ভরসায় একা থাকেন গোপালকে নিয়ে। ভীষণ শুদ্ধাচারী, গোপালের ভোগ দিয়ে তবে খান, একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একেবারে নিয়মিত পালন করেন। সেই মাসিমার কাছে বাসন্তী আমার কথা কী বলেছে জানিনা, তিনি প্রসাদ বলে বাসন্তীর হাতে পাঠাতেন, আমিও গাছের বেল, আম, আমার গৃহদেবতার প্রসাদ পাঠাতাম। এসব বেশ চলছে এমন সময় হঠাৎ বাসন্তী আবার আসছে না, আসছে না তো আসছেই না। একসপ্তাহ গেল, পনেরো দিন গেল, এবারে একমাস হতে আমি লোক খুঁজতে আরম্ভ করেছি একজন বলল বাসন্তী নাকি সুইসাইড করেছে। আমি তো হতবাক, এমন কী হল যে বেচারিকে সুইসাইড করতে হল? খালি ভাবছি এই কথা, কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না কথাটা। বাসন্তী এমনিতে বেশ ঠান্ডা মাথার মানুষ, এমন হঠকারীতা করবে সেটা যেন হজম হচ্ছে না। সেই মাসিমার সঙ্গে একদিন দেখা হতে তিনি তো বাসন্তীর শোকে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন, আমারও খারাপ লাগছে। যতই হোক, বহুদিনের সম্পর্ক ওর সাথে। যাই হোক, অন্য লোক রাখলাম বাধ্য হয়ে। বেশ আটমাস হয়ে গেল তারপরে। একদিন আমি সকালে রান্না সারছি, দেখি কে বেল দিচ্ছে সদর দরজায়। আমি ওপর থেকে “কে” “কে” জিজ্ঞেস করছি কোনো সাড়া নেই। বারান্দায় গিয়ে “কে” বলতে দেখি বাসন্তী দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভাবছি আমি ঠিক দেখছি তো, দিনের বেলায় ভুল দেখার কারণও নয়। আমি নিচে গিয়ে দরজা খুলতে এসে প্রণাম করছে যখন ও, আমি ভালো করে গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম যে হ্যাঁ জীবিত বাসন্তীই বটে।

BANGLADARSHAN.COM

আমার সঙ্গে ওপরে এসে ও বলল ওর বরের এক্সিডেন্ট হয়েছে, ও তাকে নিয়ে হাসপাতালে ছিল ছয় মাস আর ওর অনুপস্থিতিতে কিভাবে যেন রটেছে ও সুইসাইড করেছে। অনেক দুঃখ করল ওর বর শয্যাশায়ী হয়ে গেছে বলে, আমার বাড়িতে আবার ও কাজে ঢুকলো তারপরে। এমন অদ্ভুত ঘটনা আমিও ভীষণ অবাক হয়েছিলাম। ওকে শুধু বললাম, “তোমার কিন্তু পুনর্জন্ম হয়ে পরমায়ু বেড়ে গেল।” শুনে ও বলল, “আর আয়ু বেড়ে কাজ নেই, মরলেই শান্তি হত গো বৌদি।”

॥ইনটিউশন॥

স্টীল প্লান্টের একনম্বর গেটের সামনে থেকে শুরু হয়ে যে রাস্তাটা টাউনশিপের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে সেটা লিংক রোড আর দুর্গাপুর স্টীল টাউনশিপ শুরুর আগে কারখানার ধোঁয়ায় লোকের স্বাস্থ্যের যাতে ক্ষতি না হয়, তাই গ্রিনবেল্ট করা হয়েছিল দূষণ আটকাতে। এই গ্রিনবেল্টের প্রস্থ খুব বড়ো নয়, কিন্তু দৈর্ঘ্য বেশ অনেকটা জুড়েই ছিল, গ্রিনবেল্ট আসলে গাছ দিয়ে তৈরী বেষ্টনী, সেই গাছগুলো কাটতে কাটতে আর প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই এখন গ্রিনবেল্টের। গ্রিনবেল্টের পরে শুরু এজোন টাউনশিপের প্রথম রাস্তা সি আর দাস রোড আগে যেটা পেরিফেরি বলে পরিচিত ছিল, তার ঠিক পেছনেই কণিষ্ক রোড। সি আর দাসের ভেতর দিয়ে গ্রিনবেল্টের বুক চিরে দেশবন্ধুনগরের মধ্যে দিয়ে কাঁচা মাটির একটা রাস্তা চলে গেছে বেনাচিতির দিকে যেখান দিয়ে বেনাচিতি গেলে খুব সহজে আর অল্প সময়ে বেনাচিতি বাজারের পেছনে পৌঁছনো যায়। গ্রিনবেল্টের ঠিক আগে আছে কিছু জায়গা যার মধ্যে ঝান্ডাবাদ, সুকান্তনগর, দেশবন্ধুনগর অন্যতম।

সময়টা আশির দশক। এর মধ্যে এই ঝান্ডাবাদে বেশ কিছু অসামাজিক যুবকদের আড্ডা তৈরী হয়েছে যারা ব্যবসার নাম করে নানান উপায়ে কাঁচা টাকা রোজগার করে আর রাস্তা খোঁজে সেই টাকায় ফুর্তি করার। সেই ফুর্তি করার একটা সহজ উপায় হল আশেপাশের টাউনশিপ থেকে ভালো ঘরের মেয়েদের ফুঁসলিয়ে নিয়ে এসে ফুর্তি করা বা তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করা। তারপর কিছুদিন পরে তাদেরকে আর প্রয়োজন হয় না ওদের, তখন অন্য মেয়েদের দিকে নজর পড়ে।

এদের দলটায় আছে কিছু অল্পবয়সী ছেলে যেমন গণেশ, কার্তিক, দিব্যেন্দু, মনোরঞ্জন, কালু, নকুল, দেবা। গণেশ, কার্তিকের বাবার একটা দোকান বিড়ির আছে বেনাচিতি বাজারে কিন্তু ওরা দুইভাই কন্ট্রাক্টরী করে, দিব্যেন্দু, কালু ওদের সঙ্গেই আছে ব্যবসায়। মনোরঞ্জনের বাবা চাকরি করে আবার তাদের ব্যবসা আছে জেনারেটরের, ট্রাকের। নকুল কয়লা কাটার কাজ করে শাকতোরিয়া কোলিয়ারিতে ওর মায়ের সঙ্গে। নকুলের সঙ্গে আকবর রোড গার্লসের ক্লাস নাইনের ছাত্রী পুতুলের আলাপ হল রোজ পুতুলের স্কুলে যাবার সময় ওর পেছন পেছন গিয়ে গিয়ে গিয়ে। নকুলকে একদম হতকুচ্ছিত দেখতে, মিশকালো গায়ের রং, তেঢেঙে লম্বা, ক্লাস ফোর ফেল কিন্তু পুতুলকে একদম পুতুলের মতোই দেখতে, ফর্সা, ছিপছিপে, একমাথা কোঁকড়ানো চুল, টুলটুলে মিষ্টি মুখখানি, পড়াশোনায় খারাপ না। পুতুলের বাবা দুর্গাপুর স্টিলে চাকরি করেন, কোয়াটারে থাকে ওরা,পুতুলের পরে ওর দুই ভাই আছে, ছোট ছোট মোটামুটি সচ্ছল পরিবার। পুতুলদের পাশের বাড়িতে থাকেন শিকদারকাকু, উনি দুর্গাপুর স্টীলের অফিসের কর্মী আবার বাড়িতে প্রাইভেট টিউশন করেন সায়েন্স গ্রুপের, ওঁর কাছে অংক করে অমৃতা।

ক্লাস নাইনের অমৃতাকে দেখতে খুব সুন্দর, সাদাসিধে মেয়ে, ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে। পড়াশোনা, গান, বইপত্রের বাইরে খুব একটা কিছু বোঝে না ও। ওরা দুইবোন, ছোটবোন অর্পিতা অমৃতার চেয়ে এগারো বছরের ছোট, সবে নার্সারীতে ভর্তি হয়েছে। অমৃতা পড়ে গার্লস মাল্টিপারপাসে ক্লাস নাইনে, অমৃতা থাকে কণিষ্ক রোডে। ও আরো অন্য মেয়েদের সাথে স্কুলবাসের জন্য অপেক্ষায় থাকে মোড়ের শেডের তলায়, এইখানে

পাশাপাশি আছে একটা পান বিড়ির দোকান আর একটা স্টেশনারি দোকান আর ঠিক মোড়ের মাথায় দুদিকে দুটো কালভার্টের ওপরে বসার সিমেন্টের বেঞ্চ। প্রায়ই শেডের থামে ব্যাগটা হেলান দিয়ে ও গল্প করে আরো অন্য মেয়েদের সাথে, এখানে ওই গণেশদের আড্ডাখানা। অমৃতার সাথে একক্লাসে পড়ে জয়তী, দু-তিনবার ফেল করে এখন ওদের ক্লাসে পড়ে জয়তী, ওর সঙ্গে গনেশরা কথা বলে। একদিন ব্যাগ রেখে পেছন ফিরে কথা বলছিল অমৃতা ক্লাসমেট প্রিয়ার সঙ্গে, এমন সময় বাস আসছে দেখে তাড়াতাড়ি ব্যাগটা তুলতে গিয়ে দেখে জয়তী কিছু একটা ঢোকালো ওর ব্যাগে। ও ব্যাগ নিয়ে বাসে উঠে বসে খুলে দেখলো অজস্র ভুল বানানে আর কুরুচিকর ভাষায় লেখা একটা প্রেমপত্র যেটা ওকে দিয়েছে গণেশ আর সেটা ওর ব্যাগে ভরেছে জয়তী। জয়তীকে স্কুলে গিয়ে খুব ধ্যাতানি দিল অমৃতা। সেদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় অমৃতা বাস থেকে নেমে মোড় পেরোনোর সময় গণেশ যখন এগিয়ে আসছে ওর দিকে, ও দাঁড়িয়ে পড়ে জয়তীর আর গণেশের সামনে ওই চিঠিটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে বাড়ির পথ ধরে।

অমৃতার বাবা কাজ করে দুর্গাপুর স্টীলে। ওরা থাকে যে কোয়াটারে সেটা একদম গ্রীনবেল্টের পরেই। অমৃতার স্কুলে বা টিউশনে যাতায়াতের রাস্তায় এই গণেশদের দলটা প্রায়ই বিরক্ত করে ওকে, টোন টিটকিরি কাটে।ওর মাবাবা চেষ্টা করে ওকে আগলে রাখতে, কিন্তু বাড়তে থাকল এদের উৎপাত। দেখতে দেখতে মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হল ভালোভাবে, রেজাল্ট বেরোল।

পুতুলও মাধ্যমিক দিয়েছিল, দুজনেই পাশ করল, অমৃতা ফার্স্ট ডিভিশনে আর পুতুল সেকেন্ড ডিভিশনে, দুজনের স্কুলও আলাদা। সেদিন মার্কশিট দিচ্ছে বলে দুজনেই নিজের নিজের স্কুলে গেছে। বিকেল পেরিয়ে সন্ধে হল পুতুল ফিরল না, পুতুলের মা বাবা ঘর বার করছেন বারবার। করতে করতে রাত দশটায় বাড়ির বাইরে একটা বাইকের আওয়াজ আর সিঁড়িতে অনেক লোকের গলার আওয়াজ পেয়ে শিকদার কাকুও বেরোলেন। সিঁড়ি দিয়ে পুতুল উঠে আসছে একমাথা সিঁদুর পরে, শাড়ি পরে, আর ওর সঙ্গে আছে সাদা ধুতি পাঞ্জাবীতে নকুল, কালো নকুলের গায়ে সাদা পাঞ্জাবীটা একদম সেই কালো দেয়ালে সাদা চুনকামের মত লাগছে, তার সঙ্গে আছে ওই গণেশদের দলটা, ওরাই প্রান্তিকা কালীবাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়েছে ওদের। পুতুল মার্কশিট নিয়ে বেরোতে ওকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়ে এখন এসেছে পুতুলদের বাড়িতে খবর দিতে। পুতুলের মা বাবা তো এই বিয়ে কিছুতেই মেনে নেবে না, এরা নানা রকম হুমকি দিচ্ছে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। সেই সময় গণেশকে বলছে ওই ছেলেরা অমৃতার ব্যাপারে, “তোর আর চিন্তা কী, তুই তো অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা পাচ্ছিসই কদিন পরে।” সেটা কানে গেল শিকদারকাকুর। পুতুলের পুরো ঘটনাটা ওরা শুনলো শিকদারকাকুর কাছে আর পুতুলকে দেখলো ওদের বাড়িতে বিবাহিত অবস্থায় শিকদারকাকুর বাড়িতে গিয়ে, এক সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁ দিকের কোয়াটার শিকদারকাকুর আর ডানদিকেরটা পুতুলদের।

অমৃতা আর্টস গ্রুপের জন্য টিউশন নেয় চট্টরাজ স্যারের কাছে, স্যারের খুবই প্রিয় ছাত্রী অমৃতা, উনি ওকে খুব স্নেহ করেন ওর পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ, অধ্যাবসায় আর মনোযোগের জন্য। ওর সঙ্গে ওখানে পড়ে পম্পি। একদম মাথা মোটা মেয়ে, অসম্ভব ন্যাকা। ওর খুব রাগ অমৃতার ওপরে অমৃতা লেখাপড়ায় ভালো বলে, তাছাড়া চট্টরাজ স্যার ওকে এতো ভালোবাসেন, সেটা পম্পির পছন্দ নয়। পম্পি থাকে অমৃতাদের পাড়ায়,

একসঙ্গেই যায় ওরা পড়তে, দুজনের বাড়িতেই দুজনের যাতায়াত আছে। অমৃতার মা নীলিমা শিক্ষিত, উনি অমৃতাকে পড়ান। আর পম্পির মা মামনি অশিক্ষিত, একটু কেমন যেন, নির্লজ্জ, অমৃতার সামনেই উনি আর কাকু শুয়ে থাকেন অমৃতা পম্পিকে ডাকতে যায় যখন টিউশন যাবার সময়, খুব দৃষ্টিকটু ঠেকে ওটা অমৃতার চোখে। পম্পি কেমন অর্থপূর্ণ হাসে সে সময়, অমৃতার ভালো লাগে না। পম্পির মা কারণে অকারণে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে অমৃতার মা ভীষণ দজ্জাল, অমৃতার মায়ের যে মেয়েকে আগলে রাখা, এটা পম্পির মায়ের অপছন্দ। তাই তারও অমৃতার মায়ের ওপরে ঈর্ষা আছে।কী অদ্ভুত মনোস্তত্ব মানুষের!!!! উনি শুধু সুযোগ খোঁজেন কোনো উপায়ে অমৃতার মাকে অপদস্ত করার অমৃতাকে দিয়ে।

সেদিনের সেই অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা লাভের ঘটনাটা শিকদারকাকু অমৃতাকে আর ওর মাকে জানিয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন কারণ শিকদারকাকুও অমৃতাকে খুবই স্নেহ করেন। অমৃতা অন্য জায়গায় টিউশন নিলেও শিকদারকাকুর বাড়িতে ওর অবারিত দ্বার ছিল, মাঝে মাঝেই যায় ও ফিজিক্স বা অঙ্ক কোথাও আটকে গেলে। এরমধ্যে পুতুলের একটা মেয়ে হয়েছে আর মেয়ে শুদ্ধু পুতুল এসে উঠেছে বাপের বাড়িতে। তাকে আর নকুল নিয়ে যায়নি। পুতুলের আর পড়াশোনাও হয়নি। পুতুলকে দেখলে এখন অমৃতার খুব খারাপ লাগে।

অমৃতা ইংরেজি টিউশন পড়ে যে স্যারের কাছে তার বাড়িতে যাবার সময় পড়ে একটা বড়ো নির্জন মাঠ যেখানে অন্ধকারে কিছু ছেলেরা বসে থাকে। একদিন স্যারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাড়িতে ফেরার সময় অমৃতাকে ওরা আটকালো, অমৃতা অবাক হয়ে দেখলো যে এরা আসলে ওই গণেশদেরই দলটা। ওদের বক্তব্য অমৃতাকে গণেশ আর মনোরঞ্জন দুজনেরই পছন্দ, অমৃতার কাকে পছন্দ? ওকে ঘিরে ধরে যখন এসব জিজ্ঞেস করছে সেই সময় অমৃতার সঙ্গে পড়ে ওই টিউশনে কাঞ্চন, জয়দীপ ওরা এগিয়ে আসে আর অমৃতাকে এসকর্ট করে হাঁটা দেয় বাড়ির দিকে। অমৃতা সেদিন থেকে ঘুরে যাতায়াত শুরু করে ওই মাঠটাকে এড়িয়ে, ওকে তার জন্য অনেকটা ঘুরতে হলেও নিরাপদ থাকে ও।

দেখতে দেখতে উচ্চ মাধ্যমিকের ফর্ম ফিলাপ হল স্কুলে, ফর্ম ফিলাপ করে ও স্কুল থেকে বেরিয়ে দেখলো বাড়ির থেকে অত দূরে এই স্কুলের চত্বরেও গণেশরা দাঁড়িয়ে আছে স্কুল গেটের উল্টোদিকে, প্রায় আট কিলোমিটার ওদের বাড়ি থেকে এই বিধানচন্দ্র ইনস্টিটিউশন। অমৃতা পড়িমড়ি করে দৌড়োল বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ির দিকে সাইকেল নিয়ে, তাড়াহুড়োয় ওর ব্যাগ থেকে ওর মাধ্যমিকের মার্কশিট, এডমিট কার্ড শুদ্ধু পেন্সিল বক্স পড়ে গেল রাস্তায়, পেছনেই আসছে গণেশরা, ভয়ে ও আর দাঁড়ালো না, বাড়ির দিকে জোরে সাইকেল চালালো বুক ঢিপঢিপানি নিয়ে। ওদের মাঝে কিছুতেই ও পড়বে না।

এর কয়েকদিন পরে ও সবে ফিরেছে বিধান থেকে, বাড়িতে এসে আসন করছে স্নানে যাবার আগে, এমন সময় দরজায় কেউ নক করল। বাড়িতে ও আর মা, গরমের দুপুর, লু বইছে বাইরে, রাস্তা ফাঁকা, বোন স্কুলে, তখনো ফেরেনি। ও কী-হোল দিয়ে দেখলো গণেশরা দাঁড়িয়ে আছে, ও মাকে বলল সেকথা। মা ওকে ভেতরের ঘরে থাকতে বলে গিয়ে দরজা খুলল। ওরা মোট পাঁচজন এসেছে, হাতে ওর সেই পেন্সিল বক্স। মা ওদের ভেতরে ডাকলো, বসালো ঘরে। অমৃতা বারান্দা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো বাইরে ওদের বাইক আর সাইকেল

রয়েছে দাঁড় করানো। কিন্তু এবারে ওর মাকে দেখলো অমৃতা অন্য রূপে ।

মাকে ওরা বলল, "আমরা অমৃতার এই পেন্সিল বক্স দিতে এসেছি আর অমৃতাকে আমাদের পছন্দ, আপনি কার সাথে ওর বিয়ে দিতে চান, গণেশ না মনোরঞ্জন?" মা পেন্সিল বক্সটা নিল, একটুও ঘাবড়ালো না, তারপরে ঠান্ডা গলায় ভাবলেশহীনভাবে বললেন, "দেখো অমৃতার বাবা ইঞ্জিনিয়ার, আমরা তো পাল্টি ঘরে বিয়ে দেব, আমাদের পাল্টি ঘর ওই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, তাই না? তোমরা- যেমন গণেশ বিড়িওলা, ওর পাল্টি ঘর নিশ্চয় পানওলা, সিগারেটওলার আর মনোরঞ্জন ট্রাকওলা, জেনারেটারওলা, ওর পাল্টি ঘর ট্যাক্সিওলা, ব্যাটারীওলা এরাই হবে, তাই না? বিয়ে তো পাল্টি ঘর দেখে সমানে সমানে হয়, আমি যেদিন আমার মেয়েকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলার কথা ভাববো, সেদিন তোমাদের খবর দেব, ঠিক আছে?" ওরা অমৃতার মা নীলিমা দেবীর ওই ঠান্ডা মাথা অথচ রুদ্রমূর্তি আর সাহস দেখে থমকালো, ওরা ভাবেনি অমৃতার মা যিনি এমনিতে ওই নরম সরম মানুষ তিনি এভাবে প্রত্যুত্তর দিতে পারেন, এই প্রতিরোধটা ওদের হিসেবে ছিল না, তাই যুক্তিতে পারলো না বলে ওরা আর দাঁড়ালো না, শুধু যাওয়ার আগে হুমকি দিয়ে গেল, "এপাড়ায় থেকে মেয়েকে কী করে অন্য জায়গায় বিয়ে দেন দেখে নেব আমরাও।" নীলিমাদেবী হেসে বললেন, "আচ্ছা, সে দেখো এখন, আজকের মত এসো বাবারা।" বলে ওদের বেরিয়ে যাবার জন্য দরজা খুলে দিলেন। ওরা চলে গেল সেদিনের মত রাগে গজগজ করতে করতে। অমৃতার বাবা ফিরতে ওর মা ওর বাবাকে বলল কোয়াটার শিফট করার কথা কিন্তু অমৃতার বাবা এই জায়গার সুবিধে জানিয়ে রাজী হোল না শিফট করতে।

BANGLADARSHAN.COM

অমৃতা সেদিন ভীষণ ভয় পেল, ওর জন্য ওর মা বাবার কোনো ক্ষতি না হয়ে যায়!!! অমৃতা সেদিন নতুন করে চিনলো মাকে। পরে শুনলো পাড়ায় ওরা সেদিন ওকে তুলে নিয়ে যাবার প্ল্যান করে এসেছিল কিন্তু মায়ের রুদ্রমূর্তি আর সাহস দেখে পিছু হটেছে। ওরা কিন্তু যখন তখন বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় অমৃতার নাম ধরে ডেকে টোন টিটকিরি করতে লাগলো, রাতবিরেতে, দিনেদুপুরে, এমনকি অমৃতা হয়তো তখন বাড়িতেও নেই। ভয় পেলেও অমৃতা আবার মনোনিবেশ করল পড়াশোনাতে। দেখতে দেখতে টেস্ট হয়ে গেল।

অমৃতার ক্লাস আর পড়ার ক্ষতি হবে ভেবে ওকে বাড়িতে রেখে অমৃতার মা বাবা ওর বোনকে নিয়ে গেল কেন্দুলির জয়দেবের মেলায় ওকে ওদের কাজের লোক রেবাদির ভরসায় আর জানতো পম্পিরা আর শম্পারা, শম্পা রাত্রে শুতো এসে অমৃতার কাছে। পম্পির মা বাবাকে বলে গেছিল অমৃতার খেয়াল রাখতে, যেদিন গেল মা বাবা সেদিন শুক্রবার, শনিবার অমৃতার টিউশন আছে, টিউশনের পরে পম্পির মা বলল অমৃতাকে ওদের বাড়িতে গিয়ে খেতে রাত্রে। শনিবার আবার অমৃতা বারের উপোস করে পরীক্ষার জন্য, ও টিউশন পড়ে ফিরলো প্রায় সন্ধে হয় হয়, সারাদিন উপোস করা, পুজো দিলে খেতে পাবে, ও সোজা গেল কালীবাড়িতে বারের পুজো দিতে। পুজো দিয়ে ফেরার সময় পম্পিদের বাড়ির সামনে গিয়ে ও দেখলো বেশ কয়েকটা বাইক, স্কুটার দাঁড় করানো আর পম্পিদের বারান্দায় গণেশ আর মনোরঞ্জন দাঁড়িয়ে, ওরা অন্ধকারে ওকে খেয়াল করেনি কিন্তু বারান্দায় আলো জ্বলছিল, অমৃতা ওদের দেখেছে। ও আর ঢুকলোও না, দাঁড়ালো না ওখানে, সোজা সাইকেল নিয়ে বাড়িতে এসে ঢুকে গেল যখন তখন রাত নটা বাজে। ফ্রিজে মায়ের করে যাওয়া

তরকারি আর রেবাদির করা রুটি দিয়ে খেতে বসবে এমন সময় রেবাদি আর শম্পা এলো। শম্পা ওর পাড়ার বন্ধু, ওদের পাশের নীচের তলায় থাকে ওরা, শম্পার মা আবার অমৃতার মায়ের বান্ধবী। ও দিব্যি ওদের সঙ্গে গল্প করতে করতে খেয়ে নিল রাতের খাবার, তারপর শুয়ে পড়ল ও আর শম্পা দুই বন্ধুতে।

পরেরদিন নটা বাজতে না বাজতেই মাবাবা ফিরে এলো কেন্দুলি থেকে, মাবাবা গেছিলো স্কুটারে আর দশটায় এলো পম্পির বাবা, এসে ওকে জিজ্ঞেস করল ও কাল গেলো না কেন খেতে? অমৃতার মাবাবা কিছুই জানে না এই ব্যাপারে, তারা তো হতভম্ব। অমৃতা শম্পার সঙ্গে আগেই পরামর্শ করে ঠিক করে রেখেছিলো ও কী বলবে। ও বলল, “কাল টিউশন থেকে ফেরার সময় খুব শরীর খারাপ লাগছিল, তাই বাড়িতে এসে শুয়ে পড়েছিলাম আর ঘুমিয়ে গেছি অসাড়ে, রেবাদির আসা, শম্পার আসা কিছুই টের পাইনি, রেবাদির কাছে চাবি ছিল, সেটা খুলে রেবাদি ঢুকেছে আর শম্পা এসে আমাকে ডেকে তুলেছে যখন তখন রাত এগারোটা, অত রাতে আর তাই আপনাদের বিরক্ত করিনি কাকু। শরীর খারাপ বলে রাত্রে কিছু খাইওনি।” পম্পির বাবা বলল যে পম্পি আর ওর মা ওর জন্য অপেক্ষা করেছিলো রাত পর্যন্ত। অমৃতা খুব আন্তরিক ভাবে দুঃখিত হবার অভিনয় করল। পম্পির বাবা আর কিছু বলতে পারলো না, চলে গেল।

আসলে সেদিন পম্পির মাবাবা গণেশদের ডেকেছিল বাড়িতে, প্ল্যান ছিল সেদিনই মন্দিরে নিয়ে গিয়ে সিঁদুর পরিয়ে নিয়ে এসে অমৃতাকে পম্পিদের বাড়িতে রাত্রে একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে ওরা ওদেরকে, যাতে পরেরদিন অমৃতার মা বাবা এসে ওকে আর আগের কুমারী অবস্থায় ফেরত না পায়। কিন্তু সেটা অমৃতার ইনটিউশন আর বুদ্ধিতেই আর ঘটল না, ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে সাবধান করে দিল। এরপরে অমৃতার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গেল, রেজাল্ট বেরোল আর ও পড়তে চলে গেল বাইরে, কলকাতায়, গ্রাজুয়েশন করার পরে পরেই ওর বিয়ে হয়ে গেল, আর ও ফিরে যায়নি ওখানে। কিন্তু দুবারের দুটো ঘটনা ওকে বুঝিয়ে দিল যে প্রথমবার মায়ের জন্য (সেটাও ঈশ্বরেরই ইচ্ছেয়) আর দ্বিতীয়বার ঈশ্বরের অদৃশ্য হস্তক্ষেপে ওর জীবনটা অবিন্যস্ত হতে হতেও হলো না। পরেও এই ইনটিউশন ওকে অনেক প্রতিকূলতা থেকে বাঁচতে বা বেরোতে সাহায্য করেছে।

॥নজর দেওয়া॥

পাঁচবোনের ছোটজন নেহা। বাঁকুড়ার মেয়ে, এমএ পাশ,দিদিদের বিয়ের পরে তার নাম উঠলো বিয়ের খাতায় তখন তার তিরিশ, সে ধরে নিয়েছিল তার বিয়ে হবে না।

বাবা বাঁকুড়া কোর্টের পাবলিক প্রসেকিউটর, জমিদার বংশ, মাও জমিদার বাড়ির মেয়ে, তাই অঢেল পয়সা। কিন্তু মনটা সংকীর্ণ, লোকের মেরেই ওরা জমিদার, লোক খাটানোটা বংশানুক্রমিক ওদের, সেটা জিনবাহিত হয়ে এসেছে নেহার মধ্যে আর সবার ছোট নেহা, বহুদিন বাবার বাড়িতে রাজত্ব করেছে, তার স্বভাবই খবরদারি করা, কাজকর্মে একেবারে অষ্টরম্ভা সে। নেহার বিয়ে হল মেরিন ইঞ্জিনিয়ারের ছোটছেলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার রাজুর সঙ্গে কলকাতায়। রাজুর বিবাহিত আরো দুই ভাই আছে, বড়োজন অন্যত্র থাকে, মেজজন থাকে বাড়িতে বৌ রত্নাকে নিয়ে, সেই রত্না বড়ো চাকরি করে, কিন্তু তার বাবা মধ্যবিত্ত।রত্নাকে নেহা পছন্দ করে না।

বিয়ের পরে নেহার মাবাবা এসেছে কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে-, নেহার কাছেই উঠেছে। তাদের জন্য রত্না শাশুড়ির সঙ্গে রান্না করেছে, তারা এলো, খেল, এবারে বাড়ির লোকেরা খেতে বসেছে। নেহা রোগা, বেঁটে, কালো কাঠিসার চেহারার, রত্না লম্বা, ফর্সা, ভালো চেহারা তার। শাশুড়ির সঙ্গে বসে খাবার সাজিয়ে রত্না খেতে বসলো, পেছনে দাঁড়িয়ে আছে নেহার মা।

রত্না খাচ্ছে, গল্পের ফাঁকে তিনি রত্নার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, “খাচ্ছ খাও, কিন্তু তোমার পেটে কিন্তু এখনই চর্বি জমে গেছে।” রত্নার হাতটা থেমে গেল খেতে খেতে, প্রথমবার উনি এসেছেন এবাড়িতে এ কেমন ভদ্রতা? কেমন কথাবার্তা? রত্না আর খেতে পারলো না, চোখের জল চেপে উঠে পড়ল।

একঘন্টা যায়নি, ওর শুরু হল বমি আর পেটের গন্ডগোল। টানা তিনদিন চলল এমন, ভয়ে রত্না নেহার মায়ের সামনে যায় না, রান্না করে, শাশুড়ি আর নেহা খেতে দেয়।

তৃতীয় দিনে রত্নার মা ওর শরীর খারাপ খবর পেয়ে এসেছে, শুনে বললেন, “নেহার মায়ের নজর লেগে গেছে তোর।” এমন সময় রত্নার শাশুড়ি এসে বললেন, “দিদি, রত্না কদিন গিয়ে থাক আপনার কাছে, নেহার মায়ের নজর একদম ভালো না, সেদিন থেকে ওর শুরু হয়েছে পেটের গন্ডগোল। ওঁর স্বভাব কারুর ভালো দেখলে নজর দেওয়া, এক একজন এমন থাকে।” রত্না আর ওর মা সমর্থন করল।

॥রিফান্ড॥

গতবছর মার্চে তিন্নির স্নাতকস্তরের ফাইনালের একটা প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার পরেই লকডাউন হয়ে গেল, তারপরে চাপান উতোর করে করে শেষে সেই ফাইনাল হল অক্টোবরে অনলাইনে। এদিকে জুন থেকে এম এ পরীক্ষার এন্ট্রান্স হল অনলাইনে, ইন্টারভিউ দিয়ে সিলেকশন হয়ে ভর্তিটাও হয়ে গেল অনলাইনে। সেপ্টেম্বর থেকে বাইরের ইউনিভার্সিটিতে অনলাইন ক্লাস শুরু হয়ে গেল। যেহেতু অনলাইনে ক্লাস, তাই এটেন্ডেন্স নিয়ে খুব কড়াকড়ি। তার ওপরে নম্বর আছে ওদের। সকালে নটার থেকে শুরু হয়ে ক্লাস চলে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত, তারপরে আবার মেন্টরের সঙ্গে কখনো কখনো মিটিং থাকে। অচিরেই খুব চাপ মনে হতে লাগলো তিন্নির। এইভাবেই দুটো সেমেস্টার হয়ে ফার্স্ট ইয়ারটা শেষ করে সে সেকেন্ড ইয়ারে উঠলো, এবারে ওদের ইন্টার্নশীপও হয়ে গেল অনলাইনে। তারপর রেজাল্ট বেরিয়ে শুরু হল সেকেন্ড ইয়ারের ক্লাস।

তিন্নি ভীষণ ঘরকুনো, বাড়ি থেকে বেরোতে চায় না আর এই কলেজের সময়টায় যাতায়াত করতে গিয়ে দেখেছে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের অসুবিধেগুলো। তাই অনলাইনে ক্লাস বলে ও নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু সারাদিন একভাবে বসে ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ক্লাস করতে গিয়ে চোখে খুব চাপ পড়ছিল,চশমা নিতে হল। তবে ও আর ওর মা বাবা একটু নিশ্চিন্ত যে বাড়ি ছেড়ে বাইরে যেতে হয়নি। এম এ ক্লাসের সবার সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে, প্রফেসরদের সাথেও নিয়মিত যোগাযোগ আছে, কিন্তু কাউকে সামনাসামনি দেখেনি, সবটাই ভার্চুয়াল। বাড়িতে বসে ক্লাস করার জন্য বেরিয়ে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু সেই ক্লাসরুম, বন্ধুদের সাথে আড্ডা, দাঁড়িয়ে ফুচকা খাওয়া, করিডোরে দাঁড়িয়ে প্রফেসরদের সাথে আলোচনা, তাঁদের সঙ্গ, একে অপরকে ছুঁয়ে দেখা, জড়িয়ে ধরা ওগুলো খুব মিস করে ও।

তিন্নির মা অনন্যা একটা ব্যাংকের কর্মী। সেদিন সকালে সবে অফিসে গিয়ে বসেছে অনন্যা এমন সময় “প্রার্থনা শাড়ী কুঞ্জ” থেকে ফোন। ওদের পুজোর ড্রেস কালেকশন এসে গেছে, যেন একবার অনন্যা গিয়ে দেখে আসে। অনন্যার মনটা নেচে উঠলেও মনে পড়ল জিনিসগুলো বয়ে নিয়ে যেতে হবে এতটা রাস্তা। তখনই মনে পড়ল মেয়ে তিন্নি বলেছিল অনলাইনে কিনবে এবারে। মনের মধ্যে চিন্তাটা নাড়াচাড়া করতে করতে অফিসে দুয়েকজন কলিগকে জিজ্ঞেস করল অনলাইনে কেনাকাটার কথা। মার্কেটিং গ্রুপের তন্ময় বলল, “দেখো অনন্যাদি, গ্যাজেট, মোবাইল, বই এগুলো অনলাইনে কেনা ঠিকই আছে, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে এই জিনিস পেয়ে যাবে, কিন্তু আউটফিট মানে জামাকাপড়, শাড়ি এগুলো যদি সুযোগ থাকে, গিয়ে দেখেশুনে নেড়েচেড়ে কেনাই ভালো কারণ মেটেরিয়ালের টেক্সচার তুমি বুঝে নিতে পারবে, যেটা অনলাইনে ছবি দেখে বোঝা যায় না। আর খাবারও তুমি অনলাইনে অর্ডার দিয়ে আনাতেই পার, তারও কিন্তু সুবিধে অসুবিধে দুটোই আছে।” অনন্যা ভাবে ওয়ার্ক ফ্রম হোমের নতুন সিস্টেম এসেছে–ঘরে বসে ক্লাস নিন, ঘরে বসে অনলাইনে কেনাকাটা করুন, ঘর থেকে স্বাস্থ্যপরিসেবা নিন। এভাবে ক্রমাগত ঘরবন্দী জীবন এবং একটা ফ্রেমের মধ্যে আমাদের টেকনোলজিক্যালি আটকে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অন্য কেউ ভালো মন্দের মানদণ্ড ঠিক করছে। আমাদের মগজকে সম্পূর্ণ অন্য কিছুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে, এটা। সেই নিয়ন্ত্রণ থেকে

বেরোতে গেলে আমাদের আত্মশক্তি জাগাতে হবে, সংযুক্ত থাকার চেষ্টা আমাদেরই চালাতে হবে।

অনন্যার মনে পড়ল গতবছর সেই কাঞ্জিভরম কেনার ঘটনা। ও গতবছর অনলাইনে দেখে কাঞ্জিভরম শাড়ি অর্ডার করল, শাড়ির পেমেন্ট অনলাইনে হয়ে গেল, সাড়ে ছয় হাজারের কাঞ্জিভরম, হলুদ জমিতে মেরুন বর্ডার শাড়িটার, ছবি দেখে ভারী পছন্দ হল। শাড়ি আসতে খুলে দেখলো রং ঠিকই আছে, কিন্তু জমিটা যেন কেমন খসখসে লাগছে। শাড়িটা নিয়ে পাড়ার শাড়ির দোকানে দেখাতে তারা বলল এটা আর্ট সিল্ক, পিওর ব্যাঙ্গালোর সিল্ক নয়, ততক্ষনে শাড়ির প্যাকেট, ইনভয়েস ছেঁড়া হয়ে ডাস্টবিনে চলে গেছে। চোখে জল এসে গেছিল এভাবে ঠকে গিয়ে। সেই শাড়িটা আজও ওভাবে পড়ে আছে, কাউকে প্রাণে ধরে দিতেও পারেনি এতো দামী শাড়ি বলে আবার পড়তেও পারেনি, ঠিক করেছে কোথাও উপহার হিসেবে দিয়ে দেবে। তারপরেও তসর বলে ঘিয়ে রঙের সিনথেটিক শাড়ি এসেছে, সাউথ কটন বলে অন্য মেটেরিয়ালের শাড়ি এসেছে, কয়েকবার এমন হতে অনন্যা এখন ক্ষ্যামা দিয়েছে অনলাইনের কেনাকাটায়। কিনলে বই কেনে, মোবাইল, হেডফোন, স্পিকার, পাওয়ার ব্যাংক এসব কেনে।তন্ময় ঠিকই বলেছে ভাবলো অনন্যা শাড়ি, ড্রেস মেটেরিয়াল “নৈব নৈব চ।”

সেদিন বাড়িতে এসে মেয়ে তিন্নিকে অনলাইন কেনাকাটার কথা জিজ্ঞেস করতে তিন্নি বলল, “আমি অনলাইনে লাইমরোড থেকে কিনবো জামাকাপড়, তুমি চাপ নিও না।” অনন্যা চুপচাপ শুনলো, ওদের জিনিস ওরা যেখান থেকে ভালো বোঝে কিনুক, ও আর অনলাইনে কেনাকাটায় নেই।

এর কয়েকদিন পরে একটা রবিবার রাত্রে অনন্যার স্বামী অর্পিত আর তিন্নি মিলে ঠিক করল সেদিন রাত্রে ডিনারের জন্য রেশমি কাবাব বাটার মশালা খাবে, সঙ্গে বাটার নান আর রায়তা । সঙ্গে সঙ্গে তিন্নি এসে বলল, “মা, অনলাইনে জোম্যাটোতে অর্ডার করছি, ওদের ওখানে কিছু ডিসকাউন্টও দেবে,তুমি খাওয়াও আজকে।” অনন্যা বেরিয়েছিল কাজে, সবে ফিরেছে, ও শুনে জেনে নিল কত টাকা লাগবে, সবসুদ্ধ বারোশো তিরিশ টাকা, ও তিন্নিকে দেড় হাজার টাকা আর যদি খুচরো টাকার অসুবিধে থাকে তাই আরো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বাথরুমে ঢুকলো ফ্রেশ হতে, রান্নার ঝামেলা নেই, তাই বেশ সময় নিয়ে স্নান করে বেরোল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখলো টেবিলের ওপরে শোভা দিচ্ছে রাত্রের খাবার।

তিন্নি এসে হাতে অনন্যার ব্যালান্স টাকাটা দিল, দুশো কুড়ি টাকা। খুব ব্যাখ্যান করে তিন্নি বলে চলেছে ডেলিভারি বয়ের কাছে খুচরো ছিল না, ওই দুশো টাকাই ছিল, সেটা ওকে দেখে দিয়ে দিয়েছে।

অনন্যা বলল, “কিন্তু আমরা তো আরো একশো টাকা রিফান্ড পাব, তুই চিরকালের সেই ট্যালাই রয়ে গেলি, তোকে চাঁটিয়ে চলে গেল।” সাদাসিধে তিন্নির মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ কম, একদম প্রাকটিক্যাল নয় সে, তাই যখন তখন ওকে ঠকতে হয়। মায়ের কথায় এইবারে মেয়ের টনক নড়ল, অর্পিতও সহমত হল অনন্যার সঙ্গে। তিন্নি সঙ্গে সঙ্গে ওই ডেলিভারি বয় বা ভ্যালে, যার নাম সরোজ তাকে ফোন করল। সে জানালো, তখন সে অনেকদূরে চলে গেছে, পরেরদিন সে এসে রিফান্ড দিয়ে যাবে ওই একশো টাকা। অনন্যা আর অর্পিত তিন্নিকে

আর কিছু বলল না। আরো বাকী ছিল চমকের, প্যাক খুলে দেখা গেল রেশমি কাবাব বাটার মশালা নয়, এসেছে টিক্কা কাবাব বাটার মশালা, যেটা বেশ ঝাল হয় বলে ওরা এড়িয়ে চলে। অর্পিত সেটা দেখেই উল্টোদিকের দোকান থেকে গরম রসগোল্লা নিয়ে চলে এলো, ঝাল লাগলে রসগোল্লা আছে এই ভেবে।

তিন্নি খুব অপ্রস্তুত হয়েছে, আর অনন্যা ওকে বলছে, "যাক গে, ওই একশো টাকা তুই মনে কর টিপস দিয়েছিস।" সেটা শুনে তিন্নি আরো রেগে যাচ্ছে, সোমবার তিন্নি আবার টেক্সট করল ওই ভ্যালে সরোজকে যে সে টাকা দিতে আসবে কিনা জানতে, সে বলল, "আমার তো অনেক রাত হয় ফিরতে, তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে, এতো মিষ্টি ব্যবহার তোমার, টাকা রিফান্ড দিয়ে এলে তুমি কী আমাকে ভুলে যাবে?" তিন্নি তাকে বলল, "আপনি টাকাটা রিফান্ড দিয়ে তো যান আগে।" সে লিখলো, "তোমাকে দেখার জন্যই আমাকে যেতে হবে।" তিন্নি এতক্ষন মাথা ঠান্ডা রেখেছিল, এবারে অন্য বন্ধুদের জিজ্ঞেস করে সে জোম্যাটোতে কমপ্লেইন করল মঙ্গলবার, এতো সাহস ওই লোকটার ওর সঙ্গে ফ্লার্ট করছে!!!

বুধবার সকালে ভ্যালে সরোজ ফোন করে তিন্নিকে বলল, "তুমি কমপ্লেইন করেছো বলে আমার একাউন্ট থেকে জোম্যাটো একশো টাকা কেটে নিয়েছে, বলেছে তুমি না বললে আমার আই ডি ওরা ব্লক করে রাখবে, তুমি কমপ্লেইন করেছো তো, আমি তোমার টাকা আর ফেরত দেব না।"

তিন্নি বলল, "আপনার এই ব্যবহারের জন্যই আমি কমপ্লেইন করেছি।"

কাস্টমার কেয়ার থেকে তিন্নিকে তার পরেই ফোন করল, যে কথা বলছে সেও একটা মেয়ে, সে সব শুনলো তিন্নির মুখ থেকে, সেও রেগে গেল ওইভাবে তিন্নির সঙ্গে ফ্লার্ট করার চেষ্টা করেছে দেখে,তারপরে তিন্নির একাউন্টে একশো টাকা দিয়ে ওকে জানিয়ে দিল সেটা। বৃহস্পতি, শুক্রবার গেল, শনিবার সেই ভ্যালে এসে যখন টাকা রিফান্ড দিচ্ছে, অর্পিত গেল মেয়ের সঙ্গে। তিন্নিকে একা দেখে সরোজ চোটপাট আরম্ভ করেছিল, অর্পিতকে দেখে একদম পায়ে পড়ে যায় আর কী, ওর বৌ বাচ্ছা আছে, পরিবার আছে, ওর আই ডি ব্লক হয়ে গেছে বলে রোজগার বন্ধ এইসব বলছে যখন, অর্পিত বলল, "আমি একটাই প্রশ্ন করব তোমাকে, আচ্ছা, এতো ঘটনা কেন ঘটল বলতো?" মুখ নিচু করে টাকাটা দিল সরোজ। সরোজ টাকা দিয়ে তিন্নিকে কমপ্লেইন তুলে নিতে অনুরোধ করে চলে গেল।

তিন্নি টাকা ফেরত পেয়েছে বলে যখন কমপ্লেইন ক্লোজ করছে, তখন সেই জোম্যাটোর কাস্টমার কেয়ারের মহিলা ফোন করে বলল, "তিন্নি চাইলে কমপ্লেইন না তুলতেও পারে, ভবিষ্যতে আরো কেউ ওই ছেলেটির থেকে যাতে বিপদে না পড়ে সেই ভেবে।"

তিন্নি জানালো, "ওই সরোজ বলে গেছে এটা ওর প্রথমবার এমন হয়েছে, তাই প্রথম ঘটনা বলেই ওর আরেকটা সুযোগ পাওয়া উচিৎ।" কাস্টমার কেয়ারের মহিলা তিন্নির মানসিকতার খুব প্রশংসা করে ছেলেটার আই ডি খুলে দিল। তিন্নির ভালোরকম শিক্ষা আর অভিজ্ঞতা হল এই ঘটনায়। কিন্তু বই তো এখন বেশিরভাগ

অনলাইনেই কেনে ও, ক্লাসও অনলাইনেই চলছে, ক্লাসে সেই সকলের সাহচর্য ছাড়া বাকী শিক্ষা যে কম হচ্ছে বলা যাবে না মোটেই।

সেদিন আবার তিন্নি বায়না ধরেছে বাইরের থেকে কিছু আনাবে ডিনারে, এবারে মেয়েকে গার্ড করতে অর্পিত আগেই সবটা নিজের ঘাড়ে নিয়ে ওর একাউন্ট থেকে অর্ডার করল সব, অনন্যা হাসতে হাসতে বলল, “এতে কিন্তু তিন্নি আর কিছু শিখবে না।” অর্পিত নির্বিকারভাবে বলল, “সারাজীবন পড়ে আছে ওর, এখুনি আর ওকে এসবে না জড়ালেও চলবে, একেই এই অনলাইন ক্লাস আর ইন্টার্নশীপ নিয়ে বেচারা নাজেহাল।” মনে মনে অনন্যাও একমত হল তবে অনলাইনের হাতছানি এড়ানো সম্ভবও তো নয়, বেড়ানোর টিকিট, কোভিডের টিকা, ওলা উবের ক্যাব, গ্রসারী, সবই যে অনলাইনে, কিন্তু এখনো বাজারে গিয়েই কিনতে বেশী স্বচ্ছন্দ অনন্যা আর অর্পিত, তিন্নির অবশ্য অনলাইনই পছন্দ।

সোমবার অফিসের ফাঁকে অনন্যা গেল প্রার্থনা শাড়ি কুঞ্জে নতুন স্টক দেখতে, শাড়ি, ড্রেস মেটেরিয়াল ও দোকানে গিয়েই কিনবে। এই যে মানবিক সম্পর্ক তৈরী হয়েছে এতো বছর ধরে দেখা সাক্ষাতে কেনাকাটায় দোকানদার আর খদ্দেরের মধ্যে এই প্রার্থনা শাড়ী কুঞ্জে বা বাজারে, দোকানে, পাড়ায়, ব্যাংকে , এই যে একটা সংযোগ থাকা, একে অপরের অনুভূতির ভাগিদার হয়ে যাওয়া ক্রেতা বিক্রেতা থেকে, এগুলো অমূল্য, এগুলো কোনো সুবিধে দিয়ে ঘরে আটকে থেকে হয় না, হয় সামনাসামনি চোখে দেখে, অপরের ব্যথার ব্যথী, অন্যের আনন্দে উল্লাসিত হলে, যা কোনো অনলাইন পরিষেবা দিতে পারেনা। প্রযুক্তি আমাদের সাহায্য করুক, আমরা নাই বা হলাম প্রযুক্তির দাস তথা প্রযুক্তির পেছনে যারা আছে তাদের দাস।

॥সময়ের প্রতিশোধ॥

আসানসোলের শুভঙ্কর আচার্য্য বিখ্যাত তবলিয়া বৈজু মহারাজের শিষ্য, আসানসোল থেকে কলকাতায় ক্লাস করতে আসে প্রতি সপ্তাহে। শুভঙ্কর বনেদী বাড়ির ছেলে বটে কিন্তু তাদের অবস্থা এখন পড়তির দিকে। দেহে নীল রক্ত বহমান বলে সবার অহংকার আছে বটে, কিন্তু ঐতিহ্য আর আভিজাত্য বজায় রাখার চেষ্টা কারুর নেই পরিবারে। ফলে অভাব নিত্যসঙ্গী আর তাই শুভঙ্করের স্বভাব তাতে নষ্ট হতে সময় লাগেনি। ওর প্রবণতা আছে কেড়ে নেওয়ার, ছিনিয়ে নেওয়ার, ফলে ওর চরিত্রে একটা আক্রমণনাত্মক দিক তৈরী হয়ে গেছে। বৈজু মহারাজের খুবই কাছের শিষ্য সে, বাজায় অসাধারণ কিন্তু বৈজু মহারাজের আরেক শিষ্য শংকর পান্ডেও ভালো বাজায়, তার সাথে তার সুবিধে তার সবরকমের স্কেলের তবলা আছে যেটা শুভঙ্করের নেই। এটা শুভঙ্করের একটা ভীষণ ক্ষোভের জায়গা। তাই যখন যেটা দরকার সেটা নিয়ে শঙ্কর রেওয়াজে বসে যায়, অনুষ্ঠানেও যেতে পারে, ষ্টুডিওতে কাজেও অগ্রাধিকার পায়। এটা শুভঙ্করের অসহ্য লাগে। শুভঙ্করের মনে হয় একেতো বিহারী, তায় যথেষ্ট শিক্ষা সহবত নেই, ও কি বুঝবে সঙ্গীতের গভীরতা!!!! এই নিয়ে মাঝে মধ্যেই শঙ্করের সঙ্গে শুভঙ্করের মনোমালীন্য লেগেই আছে। কিন্তু শংকর মনের দিক দিয়ে ভীষণ সাদাসিধে, উদার, তাই পরে গিয়ে ওর সঙ্গে হেসে কথা বললেই ওর সব রাগ জল হয়ে যায়।

সেদিন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী বিদুষী শ্রীমতি অরুণা আত্রে প্রোগ্রাম করতে এলেন। শুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রোগ্রাম, গুরুজী আগেই শুভঙ্করকে বলেছিলেন যে অরুণা দেবীর সঙ্গে শুভঙ্করকে সঙ্গত করতে হবে, অরুণা দেবী আসার পরে শুভঙ্কর জানতে পারলো উনি 'সি' স্কেলে গাইবেন, 'সি' স্কেলের তবলা গুরুজীর কাছেও নেই। একমাত্র শঙ্করের কাছে আছে। শুভঙ্কর শংকরকে বলতেই শংকর এসে সেই তবলা ওকে দিয়ে দিল। প্রোগ্রাম হল, অরুণা দেবী খুব প্রশংসা করলেন শুভঙ্করের সঙ্গতের, দর্শক ও শ্রোতারাও খুব উপলব্ধি করল দুজনের মেলবন্ধন। অরুণাদেবী যাওয়ার আগে শুভঙ্করের ঠিকানা নিয়ে গেলেন এবং কথা দিয়ে গেলেন ওকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগতের তারকাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন। দিলেনও যোগাযোগ করিয়ে, সঙ্গীত জগতে আস্তে আস্তে সুখ্যাতি বাড়তে লাগল শুভঙ্করের। দেখতে দেখতে বছর দুয়েক চলে গেল।

শুভঙ্করের নামের আগে ততদিনে "বিখ্যাত", "প্রতিষ্ঠিত", "স্বনামধন্য" "প্রথিতযশা" বিশেষণগুলো ব্যবহৃত হয়, প্রচুর ভক্তমন্ডলী তার। ভালো তবলিয়া বলে তার অহমিকাও হয়েছে ততদিনে। একদিন হঠাৎ শংকর এসে ওর 'সি' স্কেলের তবলাটা চাইল শুভঙ্করের কাছে। শুভঙ্করের কেমন রাগ হয়ে গেল, সে ফেরৎ দিতে চাইল না তবলাটা, বলল, "তোদের তো পয়সার অভাব নেই, আরেকটা কিনে নে না।" এদিকে এই 'সি' স্কেলের তবলাটা শঙ্করের দাদুর তবলা, তাঁর স্মৃতিচিহ্ন ওর কাছে, শংকরও এটা দিতে নারাজ। শুভঙ্করকে বলার চেষ্টা করল ও ওই তবলাটার আবেগমূল্য সম্পর্কে, শুভঙ্কর পাত্তাই দিল না। প্রচুর বচসা হল দুজনের মধ্যে প্রকাশ্যে। শুভঙ্কর কিছুতেই এই অপমানটা ভুলতে পারলো না। তবলাটা দিয়ে দিল সে শঙ্করকে কিন্তু অপমানটা হজম করতে পারলো। তার দিন দশেক পর থেকে শংকর নিখোঁজ হয়ে গেল। শঙ্করের বাবা মা অনেক খুঁজলো, পুলিশে খবর দিল, কিন্তু শংকর যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এর বছরখানেকের মাথায় শুভঙ্কর চলে এলো কলকাতায় পাকাপাকি ভাবে। গুরুজী বৈজু মহারাজ সাহায্য করলেন খুব, অল ইন্ডিয়া রেডিওতে

চাকরি হয়ে গেল গুরুজীর তদবিরের জোরে শুভঙ্করের। তার কয়েক বছরের মধ্যে সে বিয়ে করল, একটা ছেলে আর একটা মেয়ে নিয়ে তার সুখের সংসার, বাড়ি কিনল জোকাতে।

****

একটা মিশনারি কনভেন্টের মণিকর্ণা ক্লাস এইটে পড়ে। তাদের ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং করতে এসেছেন একজন নাসার প্যারা সাইকোলজিস্ট শ্রীমতি সুনন্দা দ্বিবেদী। অবিবাহিত সুনন্দা ম্যাডাম ওই কনভেন্ট স্কুলের প্রিন্সিপালের সহপাঠী কিন্তু নিজে সাধনা করে বেশ কিছু অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী তিনি, কলকাতায় সল্টলেকে তাঁর বাড়ি। প্রথম যেদিন তিনি মণিকর্ণাকে দেখেন ওঁর খুব ভালো লেগে যায় ওকে কারণ মেয়েদের স্কুলের বেশিরভাগ মেয়ে যারা ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ের জন্য এসেছে সবার প্রশ্ন “তাদের বিয়ে কেমন হবে, কটা বাচ্ছা হবে”, ব্যতিক্রমী দু চারজন আগ্রহী নিজেদের ক্যারিয়ার নিয়ে, একমাত্র মণিকর্ণার আগ্রহ প্যারা সাইকোলজি, মেটাফিজিক্স, সুনন্দা ম্যাডামের কাজের ব্যাপারে কারণ সে নিজে সাইকোলজিস্ট হতে চায় ভবিষ্যতে আর এখনই সে পড়ে ফেলেছে সাইকোলজির সিগমুন্ড ফ্রয়েডের লেখা বহুল প্রচলিত তিনটে বই “The Interpretation of Dreams”, “Three essays”, “A General Introduction to Psychoanalysis।” রীতিমতো চর্চা করে সে অতীন্দ্রিয় জগৎ নিয়ে। মণিকর্ণা আকর্ষিত হল সুনন্দা ম্যাডামের প্রতি অন্য কারণে, সুনন্দা ম্যাডাম স্কুলে বসে বলে দিলেন তাদের দুশো বছরের পুরোনো বাড়ির অবস্থান, তাদের যৌথ পরিবারের লোকেরা কে কেমন, কাকে কেমন দেখতে, কার অপরের প্রতি কেমন মনোভাব, পরিশেষে এও বললেন যে তাদের বাড়ির লাগোয়া পুকুরে একজন ডুবে মারা গেছিল, তারপর থেকেই ওই পুকুরটায় দোষ দেখা দিয়েছে । মণিকর্ণা পুকুরটার কথা জানতো কিন্তু সেটার এই ঘটনা সে শুনে এসে তার তান্নাকে (ঠাকুমা) জিজ্ঞেস করে জানলো যে সেটা যথার্থ। এর ফলে তার সুনন্দা ম্যাডামের সাথে একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরী হল, সুনন্দা ম্যাডাম কাউন্সেলিংয়ের শেষ দিনে ওকে ওঁর ইমেইল ও যোগাযোগের সব কন্টাক্ট দিয়ে গেলেন। আরও দুবার উনি এলেন ওদের স্কুলে। শেষবারে ওকে বলে গেলেন এর পরের বার উনি মণিকর্ণার মা বাবার সঙ্গেও দেখা করবেন।

মণিকর্ণা ক্লাস টেন পাশ করে অন্য স্কুলে শুধু সাইকোলজি আছে বলে ভর্তি হল। সেই স্কুলে ওর সিক্সথ সাবজেক্ট ছিল মিউসিক, সেখানে ক্লাস করতে গিয়ে ওর আলাপ হল শুভদীপের সাথে। শুভদীপ ওর চেয়ে এক ক্লাস জুনিয়র কিন্তু বয়সে বড়ো। সে অনেকগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট একসাথে বাজাতে পারে, ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিক থেকে ভায়োলিনের প্রাইমারি করেছে। ওদের স্কুলের প্রোগ্রামের স্ট্যান্ডিং সহযোগী বাদক শুভদীপ, যে বেহালা, কিবোর্ড, বাঁশি, তবলা, একাউস্টিক সব যন্ত্র খুব ভালো বাজায়। মণিকর্ণা নিজে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সিনিয়র ডিপ্লোমা করেছে, পাতিয়ালা ঘরানার এক ওস্তাদের ছাত্রী, ভীষণ ভালো গায়, নিজের মিউজিক্যাল সেন্স খুব ভালো। শুভদীপের বন্ধু প্রীতম ড্রাম বাজায়, একই স্কুলের ছাত্র, আরও কয়েকজনকে নিয়ে ওদের অচিরেই একটা ব্যান্ড তৈরী হয়ে গেল।

আস্তে আস্তে মণিকর্ণার সাথে শুভদীপের খুব আন্তরিক সম্পর্ক তৈরী হল, মণিকর্ণা জানতে পারলো শুভদীপ স্কুলের পরে রাত্রে একটা কল সেন্টারে চাকরি করে বাড়ির চাপে। ওর বাবা মা ওকে খুব চাপ দেয় পয়সাকড়ির

জন্য। শুভদীপের বাবা শুভঙ্কর আচার্য্য একজন প্রখ্যাত তবলিয়া, দেশের বহু নামী সঙ্গীত জগতের নক্ষত্রদের সাথে নিত্য তাঁর ওঠাবসা, নিজের বাড়ির দেয়াল জুড়ে তাঁর ছবি বিভিন্ন সাঙ্গিতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে। নিজে একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চের কর্তাব্যক্তি। বহু বড়ো সঙ্গীতশিল্পীর অন্তরঙ্গজন তিনি, কিন্তু লোক ভালো না। ওঁর ইচ্ছে মণিকর্ণাকে লিড সিঙ্গার করে উনি জমিয়ে ব্যবসা করবেন, শুভদীপ কিন্তু মণিকর্ণাকে বোনের মতো দেখে এবং বাবার এই ইচ্ছের ও ঘোরতরো বিরোধী। মণিকর্ণাকে সে বারণ করে দিল ওদের বাড়িতে যেতে। তাই মণিকর্ণা সঙ্গে রিহার্সাল থাকলে ও চেষ্টা করে স্কুলে করে নিতে বা মণিকর্ণার বাড়ি যেতে। মণিকর্ণাকে নিয়ে বাবার সঙ্গে শুভদীপের ঝামেলা এমন চরমে উঠল যে শুভদীপকে বাড়ি থেকে বের করে দিল ওর বাবা। মণিকর্ণা যেহেতু স্কুলের প্রিন্সিপালের বিশেষ স্নেহের পাত্রী, প্রিন্সিপাল ওকে ওঁর মেয়ে বলেন, তাঁকে বলে মণিকর্ণা শুভদীপের বেহালা শিক্ষকের চাকরির ব্যবস্থা করে দিল ওদের স্কুলে। শুভদীপ আলাদা একটা বাড়ির একতলায় ভাড়া থেকে স্কুলের চাকরি আর লেখাপড়া চালাতে লাগল। সেখানেও ওর বাবা পার্টির ছেলেদের দিয়ে হুমকি দিইয়ে ওকে বাধ্য করল বাড়ি ছাড়তে। ও অন্য জায়গায় বাড়ি ভাড়া করল এবং বাড়ির সঙ্গে পুরো যোগাযোগ কেটে দিল। মণিকর্ণা বন্ধুদের সাথে মাঝে মাঝে যেত ওর বাড়িতে রিহার্সাল করতে। ক্রমে শুভদীপ বারো ক্লাস শেষ করে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়তে ঢুকল, মণিকর্ণা ও অন্য বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ আছে ওদের ব্যান্ডের জন্য। মণিকর্ণাও গ্রাজুয়েশন করছে।

এমন একদিন সন্ধেবেলায় ভিডিও কলে কথা বলার সময় মণিকর্ণা লক্ষ্য করল শুভদীপের সারা মুখে কালশিটের দাগ, ও জিজ্ঞেস করল শুভদীপকে যে ওর কি শরীর খারাপ। উত্তরে শুভদীপ জানালো যে বিগত দুমাস ধরে রাত্রে ঘুমের মধ্যে ও স্বপ্নে দেখছে কেউ ওকে মারছে আর সকালে উঠে দেখছে ওর শরীরের সেই মার খাওয়া জায়গাগুলোতে কালশিটে পড়ে ফুলে গেছে, ব্যথা। মণিকর্ণা গিয়ে ধরল ওর মাকে, তিনি কী কিছু করতে পারেন সাহায্য? মা আর কি করবেন, তিনি বললেন শুভদীপকে বালিশের তলায় ঠাকুরের ফুল নিয়ে শুতে। এমনিতে শুভদীপ পুজো করে, মা কালীর ভক্ত। মণিকর্ণা ওকে বলল যে মা কালীর কাছে যে ধূপ দেয় শুভদীপ রোজ, সেই ধূপের ছাইয়ের টিকা লাগিয়ে শুতে রাত্রে। শুভদীপ সেদিন রাত্রে তাই করল এবং সেদিন থেকে ওর সেই দুঃস্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়ে গেল। এই ঘটনা যেদিনের সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। শুক্রবার রাত্রে মণিকর্ণা হঠাৎ জ্বরে পড়ল এবং একেবারে কাহিল হয়ে পড়ল সে।

শনিবার রাত্রে সুনন্দা ম্যাডাম হঠাৎ ফোন করল মণিকর্ণাকে এবং খুব বকাবকি করল। মণিকর্ণার মা জানতে চাইল মণিকর্ণার কাছে, “কি ব্যাপার, হঠাৎ উনি ফোন করলেন কেন?” উত্তরে মণিকর্ণা যা বলল শুনে মণিকর্ণার মায়ের রীতিমতো ভয় ধরে গেল। শুভদীপ যে ধূপটা জ্বালিয়ে তার ছাইয়ের টিকা পড়েছে সেটা আসলে মণিকর্ণার দেওয়া এবং ছোঁয়া। এর ফলে মণিকর্ণা নিজের অজান্তে এক অদ্ভুত জালে জড়িয়ে গেছে। যে শুভদীপের স্বপ্নে এসেছে সে হল এক অতৃপ্ত আত্মা যার মৃত্যুর পরে তার পারলৌকিক কাজ হয়নি। শুভদীপ জানেও না সে কে কিন্তু সুনন্দা ম্যাডাম মণিকর্ণাকে বলল তার পরিচয় যা উনি ওঁর সাধনবলে জেনেছেন। এ হল সেই শংকর পান্ডে যাকে শুভদীপের বাবা শুভঙ্কর আচার্য্য আসানসোলে সেই তবলা নিয়ে বিবাদের জেরে এক রাত্রে ডেকে নিয়ে এসে মেরে পুঁতে দিয়েছিল পঁচিশ বছর আগে। সে এর মধ্যে শুভঙ্করের ক্ষতি করতে তাকে নানাভাবে বিরক্ত করছিল। শুভঙ্কর এক তান্ত্রিককে ধরে পয়সাকড়ি খরচা করে যজ্ঞ করিয়ে তাবিজ

করিয়ে নিজের গলায় পরেছে আর পুরো বাড়ির বাস্তুবন্ধন করিয়েছে, তাই শুভঙ্কর এখন শঙ্করের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সেই জন্যই সে এসে শুভদীপকে ধরেছে। আস্তে আস্তে শুভদীপকে সে প্রাণে মেরে দেবে। সুনন্দা ম্যাডাম বললেন মণিকর্ণাকে ওদের যে সিদ্ধপুরুষ গুরুদেব আছেন, তাঁর সাথে কথা বলতে। নাহলে মণিকর্ণা অচিরেই আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং মারাও যেতে পারে। মণিকর্ণা মা-বাবা তো এইসব শুনে ছুটলেন গুরুদেবের কাছে, তাঁকে সব বলতে তিনি সুনন্দা ম্যাডামের কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন, মণিকর্ণাকেও বকুনি দিলেন। তারপরে বললেন যে এর থেকে বাঁচতে শুভদীপকে ওই শঙ্করের পারলৌকিক কাজ, শ্রাদ্ধ ও পিন্ডদান করতে হবে, তবেই ও মুক্তি পাবে, আর ক্ষতি করবে না ওর বা মণিকর্ণার।

পরেরদিন মণিকর্ণা শুভদীপকে সব বলার পরে শুভদীপ গেল কালীঘাটে, সেখানে পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলে জানলো বারো হাজার টাকা লাগবে এই সমস্ত প্রক্রিয়াটাতে আর পুরো দুটো দিন লাগবে। কারণ প্রতি বছরের বাৎসরিক কাজ করে তারপরে শেষ কাজটা হবে। শুভদীপের তখন নিজের আর মণিকর্ণার প্রাণ বাঁচানোর দায়। সে রাজী হল এবং দুদিন ধরে সেই কাজ করল ও পিন্ডদান করল গঙ্গায় গিয়ে। তারপরের দিন মণিকর্ণাকে রাত্রে এসে শংকর হাতজোড় করে ধন্যবাদ জানিয়ে গেল ঘুমের মধ্যে। মণিকর্ণা তো তাকে কখনো দেখেনি, তাই প্রাথমিক ভাবে বুঝতে পারেনি যে হঠাৎ একজন অপরিচিত কেউ কেন ওকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে, পরেরদিন সেই কথা মাকে বলতে মা বললেন শুভদীপকে জিজ্ঞেস করতে ওই অপরিচিত লোকের চেহারার বর্ণনা দিয়ে জানতে যে সেটা শঙ্কর কিনা। শুভদীপকে সেই কথা বলতে শুভদীপ সঙ্গে সঙ্গে বলে দিল যে ওটা শঙ্করই বটে। তারপরে শুভদীপের বাড়িতে বাড়িওয়ালার কাছে এলেন এক তান্ত্রিক, তিনি ঢুকেই বললেন যে এখানে অশুভ আত্মার উপস্থিতি ছিল কিন্তু কোনো সিদ্ধ মহাত্মার হস্তক্ষেপে সেই আত্মা মুক্তি পেয়ে গেছে।

এর মধ্যে শুভদীপ হোটেল ম্যানেজমেন্ট শেষ করে বিদেশে চাকরি পেয়ে গেছে। ওর ইচ্ছে ও বিদেশে গিয়ে লন্ডনের ট্রিনিটি কলেজ অফ মিউসিক থেকে ওয়েস্টার্ন মিউজিকে ডিগ্রী নিয়ে আরও শিখবে বেহালা এবং ওখানেই থেকে যাবে। বিদেশ যাবার ঠিক আগে একদিন শুভঙ্কর এলেন শুভদীপের কাছে তার সাথে দেখা করতে ও তাকে বাড়িতে ফেরাতে। সেদিন তিনি বসে স্বীকার করলেন যে খ্যাতির অহংকারে তিনি সেই সময় শুধুমাত্র তার বিরোধিতা করেছিল বলে রাতারাতি শঙ্করকে বাড়ি থেকে ডাকিয়ে নিয়ে এসে মেরে পুঁতে দিয়েছিলেন পঁচিশ বছর আগে আসানসোল শহরের উপকণ্ঠে একটা মাঠের মধ্যে, এবং তিনি যে তান্ত্রিককে দিয়ে আটকে ছিলেন শঙ্করের আত্মাকে, সেই তান্ত্রিক তাঁকে বলেছে যে তাঁর ছেলে শুভদীপ শঙ্করের শ্রাদ্ধ ও পিন্ডদান করে তাকে মুক্তি দিয়েছে। শঙ্করের বাড়ির লোক আজও জানে শঙ্কর নিখোঁজ। তারা জানেই না যে শঙ্কর জীবিত নেই আর। সেসব শুনে শুভদীপ একবাক্যে বলে দিল যে সে আর কখনোই ওই বাড়িতে ওর বাবা মায়ের কাছে ফেরত যাবে না, যোগাযোগ রাখবে, প্রয়োজন পড়লে সাহায্য করবে কিন্তু এমন সাংঘাতিক অহং সর্বস্ব লোক যে নিজের স্বার্থের জন্য কারুর প্রাণ নিতেও পিছপা নয়, তার সঙ্গে এক ছাদের তলায় থাকতে পারবে না, শুভঙ্কর নিজের স্বার্থের জন্য করতে পারেনা হেন কোনো কাজ নেই তা সে নিজের জীবনেও দেখে নিয়েছে, তাই তাঁকে আর সে বিশ্বাস করে না। আবার যেহেতু শুভঙ্কর ওর জন্মদাতা পিতা, তাই আইনের সাহায্য নিয়ে বাবাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতেও তার বিবেকে বাঁধছে। অহংকারের চক্রে পড়ে শুভঙ্কর

হারালেন চিরতরে তাঁর বংশের উত্তরাধিকারকে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে। শুভদীপ চিরতরে শুভঙ্করদের ছেড়ে পাড়ি দিল বিদেশে। অহং রিপুর কবলে পরে শুভঙ্কর হারালেন ছেলেকে।

শেষ বয়সে ডান দিকটা পড়ে গেল পক্ষঘাতে, মুখের একটা দিক গেল বেঁকে। স্ত্রী আগেই চলে গেছেন দশ বছর আগে, মেয়ের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু জামাই ভীষণ অন্যরকম, মেয়েকে বাপের বাড়িতে আসতেই দেয় না। তিনতলা বাড়িতে একা পড়ে আছেন শুভঙ্কর, আক্ষরিক অর্থে গুঁয়ে মুতে হয়ে আর প্রতিদিন নিজেকে অভিশম্পাত দিচ্ছেন এইরকম অভিশপ্ত জীবনের জন্য। ছেলে এখন প্রতিষ্ঠিত, লন্ডন স্কুল অফ মিউজিকের শিক্ষক, নিজেও ভালো বাজায় কিন্তু সেই যে গেছে আর বাড়িমুখো হয়নি। শুভঙ্কর শুনেছেন ছেলের বৌ আর নাতি নাতনিরা সবাই হয় কোনো যন্ত্র বাজায় নয় গায়। তাদের ভীষণ সম্ভ্রমের আর সম্মানের পরিচিতি, অথচ বাড়িতে আসে না। প্রতি নিয়ত চোখের জলে ভাসতে ভাসতে জগৎপিতার কাছে আর্জি জানান শুভঙ্কর তাঁকে ক্ষমা করে দিয়ে যেন নিষ্কৃতি দেন ঈশ্বর এই জীবন যন্ত্রনা থেকে আর শঙ্করের আত্মার কাছে প্রণতি জানান তাঁকে যেন এই যন্ত্রণার থেকে রেহাই দিতে, বিগত পনেরো বছরে তিনি প্রতি পলে, প্রতি ক্ষণে অনুভব করেছেন কি ভয়ঙ্কর কাজ তিনি করেছিলেন মুহূর্তের অহংকারে ভুলে আর রিপুর কবলে পড়ে আর অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছেন, স্ত্রীও তার শেষ জীবনে তাঁকে প্রতি মুহূর্তে অভিশাপ দিয়েছেন তাঁর এই কর্মের জন্য। আজ তিনি সর্ব অর্থে সব দিক দিয়ে একা দাঁড়িয়ে বিশ্বপতির দরবারে তাঁর শেষ বিচারের আশায়।

॥বরদান॥

বৃন্দাবন থেকে শ্রীক্ষেত্র পুরীর দিকে এগিয়ে চলেছে লোচনদাস আর চরণদাস। পরমবৈষ্ণব লোচনদাস বৃন্দাবনের সিদ্ধমহাত্মা যাঁর স্নেহছায়ায় বড়ো হয়েছে অন্ধ অনাথ চরণদাস। বৃন্দাবনের বাঁকেবিহারীর মন্দিরের বাইরে লোচনদাসের যমুনাতীরের কুঠিয়ার সামনে একদিন পেয়েছিলেন তিনি সদ্যজাত চরণদাসকে। চরণদাসের কাছে তিনিই পিতামাতা, তিনিই গুরু। আট বছরের চরণদাসকে তিনিও সন্তানস্নেহেই প্রতিপালন করেছেন। জন্ম থেকে সাধুসঙ্গে থাকার কারণেই হোক, কী পূর্বজন্মের সংস্কার থাকার জন্যই হোক, চরণদাস আক্ষরিক অর্থে হরি চরণেরই দাস, হরিময় তার জীবন আর সেই জীবনের একমাত্র বন্ধন তার লোচনদাস বাবাজী।রোজ বাঁকেবিহারীকে সে শোনায় তার গান আর হয় ভাবে আপ্লুত।হরিরূপী বাঁকেবিহারীই তাকে বলেছে জগন্নাথের মাহাত্ম্য, তাই জগন্নাথের কৃপালাভের আশায় তাদের এই যাত্রা।

যাত্রা শুরু করেছে তারা গ্রীষ্মের শেষে পদব্রজে, সবে আষাঢ় পড়তে তারা বহুপথে ঘুরে, বহু দেশের মধ্যে দিয়ে, অনেক ক্লেশ স্বীকার করে এসে পৌঁছলো জগন্নাথক্ষেত্র পুরীতে। সারাপথ দুজনে জগন্নাথস্তব করতে করতে এসেছে। এসে তারা উঠলো গম্ভীরার কাছে লোচনদাস বাবাজীর গুরুর আখড়ায়। পথশ্রমে ক্লান্ত চরণদাসকে লোচনদাস বললেন বিশ্রাম নিতে কিন্তু সে তখনি যাবে মন্দিরের সামনে মন্দিরের ধ্বজা দেখতে আর গরুড়স্তম্ভ দেখতে। আখড়ার লোকজন হেসে অস্থির, “অন্ধ আবার দেখতে যাবে মন্দির!!!” লোচনদাস তাদের ব্যবহারে বিরক্ত হলেও তারা আশ্রয়দাতা বলে কিছু বললেন না। গুরু-শিষ্য উভয়ে গিয়ে দর্শন করে এলো সেদিন প্রভুর মন্দির।

চারদিন পরে এলো আষাঢ় মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া, রথযাত্রা তিথি। সেদিন রথারূঢ় জগন্নাথ দর্শনে নাকি পুনর্জন্ম হয় না। লোচনদাস বালক চরণদাসকে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন রথের রাস্তায়, কিন্তু চারিদিকে যে অসম্ভব ভিড়, শুধুই কালো কালো মাথা নজরে আসছে। লোচনদাস একবার ভাবলেন চলে আসবেন ওখান থেকে কিন্তু বালক চরণদাসের জেদের কাছে তিনি হার মানলেন। একে একে আসতে লাগলো তিনটে রথ, প্রথমে গেল বলভদ্রর তালধ্বজ, তারপর সুভদ্রার দর্পদলন আর শেষে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ জগন্নাথের নন্দীঘোষ। হুড়োহুড়িতে লোচনদাসের ধরা হাত থেকে চরণদাসের হাতটা ছিটকে গেল। চরণদাস পড়ে গেল রথের চাকার সামনে, প্রানপন চেষ্টায় সে উঠে দাঁড়িয়ে যখন দেখছে একজন বলল, “এই তুই তো অন্ধ, তুই আবার কী দেখবি?” বিনীতস্বরে চরণদাস বলল, “আমি না দেখতে পেলেও, প্রভু তো আমায় দেখবেন, দেখতে পাবেন, তাই তাঁর দৃষ্টিপথে থাকছি।” এবারে সেই লোকটাই ওকে উঁচু করে তুলে ধরল রথের সামনে আর দর্শন করালো, স্পর্শ করালো রথের রশি।

কিছুপরে আবার একটা ভিড়ের ধাক্কার ঢেউ এলো আর চরণদাস পড়ে গেল মাটিতে। ওপর দিয়ে লোকজন চলে গেল, পায়ের চাপে জ্ঞান হারালো।

একটু পরে ওর মনে হল ওকে যেন স্বয়ং জগন্নাথ বলছেন, “আমি তোকে ডেকে এনেছি তোকে দেখবো বলে।

তোকে যে কিছু দেব আমি। বল তোকে বাইরের দৃষ্টি দেব না অন্তরের দৃষ্টি দেব, কোনটা চাস?"

চরণদাস আচ্ছন্ন অবস্থায় বলল, "আমার মনোরথে অধিষ্ঠিত হও প্রভু। তোমাকে অন্তরে দেখতে পাই যেন নিয়ত।"

জগন্নাথ বলল, "বেশ তাই হবে আর তুই কাউকে স্পর্শ করলে সে সুস্থ হয়ে যাবে, এটা তোকে বরদান করলাম আমি।"

চরণদাসের জ্ঞান ফিরতে দেখলো সে পথের ধারে একটা দোকানের চাতালে শুয়ে আছে কিন্তু অন্ধচোখ জোড়া না খুলেও সে সব দেখতে পাচ্ছে আর আজ্ঞাচক্রে জ্বলজ্বল করছে চাকা আঁখি জগন্নাথের মূর্তি। সে উঠে বসলো। সত্যি সত্যিই তার দিব্যদৃষ্টি লাভ হল জগন্নাথের কৃপায়। খুঁজতে খুঁজতে বহুক্ষণ পরে দেখা মিলল তার গুরু লোচনদাসের। গুরু-শিষ্য দুজনেই দুজনকে পেয়ে কেঁদে অস্থির।

ফিরে চলল আখড়ায়, সেখানকার রাঁধুনি বদ্রীনাথের ছিল বহু পুরোনো পিত্তশূলের ব্যথা, থেকে থেকেই সেটা চাগাড় দিত আর সে যন্ত্রণায় কাতরাতো। আখড়ায় পৌঁছতে তারা দেখলো যে বদ্রীনাথের সেই পিত্তশূলের ব্যথা বেড়েছে, সে সেই ব্যথার তাড়সে কাতরাচ্ছে, ব্যথায় কাবু বলে রথ দেখতে যায়নি, কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছে। চরণদাস গিয়ে তার পেটে হাত বুলিয়ে দিতে নিমেষে তার ব্যথার উপশম হল। সে তো চরণদাসকে নিয়ে কী করবে ভেবে পায় না। সে ছুটলো রথ দেখতে। সেখান থেকে বহু উপহার সামগ্রী কিনে আনলো চরণদাসের জন্য অথচ এই চরণদাসের অন্ধত্ব নিয়ে কত বিদ্রুপ সে করেছে!!! সেসব মনে করে বড়ো লজ্জা পেল বদ্রীনাথ। নিমেষে চরণদাস তার আপনার জন হয়ে গেল।

লোচনদাস আর চরণদাস ঠিক করেছে তারা উল্টোরথের পরেরদিন যাত্রা শুরু করবে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে। আখড়ায় সবার মনখারাপ কারণ এই ক'দিনে রোজ তারা চরণদাসের ভজন শুনে দিব্যভাবের জোয়ারে ভেসেছে, উল্টোরথের দিন আবার দর্শন হল প্রভুর। পরেরদিন ফেরা আছে, তাই রাত্রে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল ওরা, ভোরে উঠে বেরোবে, রোদ্দুরের তেজ বাড়ার আগে যতটা এগিয়ে থাকা যায় আর কী!!

একটু পরে সেই আখড়ায় ডাক এলো রাজার বাড়ি থেকে, রাজার হঠাৎ অম্লশূলের ব্যথা শুরু হয়েছে যাতে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন, জগন্নাথ স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন চরণদাসকে নিয়ে গিয়ে দেখাতে। তাই রাজকর্মচারীরা এসেছে। চরণদাস গেল এবং তার স্পর্শমাত্র রাজা সুস্থ হলেন। আর ঠিক সেই কারণেই আর উনি চরণদাসকে ছাড়তে চাইলেন না, এটাও জগন্নাথের নির্দেশ। চরণদাস আর লোচনদাসকে কুঠিয়া বানিয়ে দিলেন রাজা মন্দিরের চেয়ে বেশ খানিকটা দূরে বালিঘাইতে। ব্যবস্থা করলেন যাতে ওদের রোজ জগন্নাথের দর্শন হয় মন্দিরে আর রোজ ওরা ভোগ প্রসাদ পায়। জগন্নাথ নির্দেশ দিয়েছেন তিনি চরণদাস আর লোচনদাসকে রোজ দেখতে চান, ওদের ভজন শুনে যেন তার নিদ্রাভঙ্গ হয় আর রাত্রে শয়ন আরতিতেও যেন ওরা ভজন শোনায় প্রভুকে। পুরীর রাজামশাই সব ব্যবস্থা করলেন। প্রধান পুরোহিত অসম্ভব স্নেহ করেন এদের। তাদের সেই

কুঠিয়ায় গিয়ে সৎসঙ্গে সময় কাটান।সেখানে ওরা নিজেদের সাধনভজন আর লোকের আরোগ্য করে কাটাতে লাগলো তাদের দিন।

ছেলেমানুষ চরণদাসের ইচ্ছে সে তীর্থদর্শন করে পুণ্য অর্জন করে, জগন্নাথ বললেন, “সদ্গুরুর চরণকমল সর্ব তীর্থসার, তোর সদ্গুরু লোচনদাস তো রয়েইছে সঙ্গে, কোথাও যেতে হবে না তোকে, আর শ্রীক্ষেত্রে গুরুসঙ্গ আর সান্নিধ্যে অশেষ পুণ্য হয়, তুই তো গুরুর সঙ্গ সর্বদা করছিস। তোর এজন্মেই মুক্তি হয়ে যাবে।” শুনে শান্ত হল চরণদাস।

চরণদাসের আক্ষেপ ছিল প্রয়াগের ত্রিবেণীতে স্নান হল না, জগন্নাথ বললেন ওকে রথের চাকার যে তিনটে দাগ পড়ে, ওতে গড়াগড়ি খেলেই সেটা ত্রিবেণী স্নানের পুণ্য হবে, চরণদাস তাই করল। আরেকবার চরণদাসের ইচ্ছে হল বেদ শ্রবণের, জগন্নাথ আবার ওকে বলে দিলেন রথের চাকার আওয়াজই বেদ। কিছুতেই তিনি চোখের আড়াল করেন না চরণদাসকে। কিন্তু চরণদাসের বড়ো আক্ষেপ যে সে বাঁকেবিহারীকে আর দেখতে পাচ্ছে না। বাঁকেবিহারীর রূপ ধরেই জগন্নাথ দর্শন দিলেন ওকে। মন শান্ত হল। ধীরে ধীরে ওই শ্রীক্ষেত্র পুরীতেই আস্তে আস্তে জীবনাবসান হলো গুরুশিষ্য উভয়ের, বলাবাহুল্য দুজনকেই জগন্নাথ কোলে তুলে নিলেন অন্তিমে। রথে জগন্নাথ দর্শনের অভিলাষে এসে দুজনের জীবনপথ জগন্নাথময় হয়ে দিব্য সুষমায় ভরে উঠলো।

॥সুর দিয়ে ছোঁয়া॥

"গুরু বিনে রইবো কেমনে,
গুরু হলেন অন্তর্যামী,
গুরু হলেন পরম দামী, জীবনে।

প্রীতির পার্ট ওয়ান পরীক্ষা শেষে সুবর্ণা আর প্রীতি ঠিক করল কোথাও একটু যেতে হবে, সেটা যদি একদিনের জন্যও হয় তাই সই, আর ভালো লাগছে না ঘরে। সেই মত মা আর মেয়ে পরামর্শ করে ঠিক করল ওরা যাবে নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জায়গায়। পরীক্ষার মধ্যেই প্রীতির বাবা চলে গেলেন তাঁর অফিস ট্যুরে চেন্নাই, তাঁকে আর জড়ালো না তারা। পরীক্ষা শেষ হবার তিনদিন পরে ওরা বেরিয়ে পড়ল।

সেইদিনই ফিরবে ওরা, ভোরে বাড়ি থেকে হাওড়ায়, বেলা আটটার ট্রেন ছাড়লো, নবদ্বীপে পৌঁছবে সাড়ে দশটায়।ট্রেন ছুটলো নবদ্বীপধামে। সময়টা আশ্বিনের শুরু, দুপাশের শ্যামলিমায় মনটা সজীব হয়ে উঠলো, চোখ জুড়োনো সবুজের সমারোহ দুপাশে। পুকুরের ধারে ধারে পাট শুকোতে দিয়েছে চাষীরা, মেটে রঙের সেই শুকনো পাট দাঁড় করানো দেখা যাচ্ছে ট্রেনে বসে, দূরে বকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে নীল আকাশের গায়ে, ক্ষেতের নবীন ধানের চারাগুলো হাওয়ায় দুলছে, মনটা ট্রেনে বসেই ভালো হয়ে যাচ্ছে।রিজার্ভ কামরায় সবে একটু ঢুলুনি এসেছে হঠাৎ গানের আওয়াজে তন্দ্রা কেটে গেল প্রীতির। ফাঁকা কামরার আরেক প্রান্তে কেউ গান গাইছে খোলা গলায়,

"ভুবনমোহন গোরা,
সে যে গুনিজনার মনোচোরা,
তারে ও নয়নে নয়ন রেখে আর খোয়াবো না,
না, না, না ছেড়ে দেব না।
তোমায় হৃদমাঝারে রাখবো,
ছেড়ে দেব না।"

খুব জনপ্রিয় বাউলগান, কিন্তু যে গাইছে সে খুব আন্তরিকতা দিয়ে গাইছে। একটু পরেই সেই গায়ক এসে দাঁড়ালো সামনে প্রীতিদের, এক বাউল বাবাজী, গেরুয়া পরা, মাথায় অবিন্যস্ত বাবরি চুল কপালের ওপরে ফেট্টি দিয়ে বাঁধা, নিমাইদাস বাবাজী বলল নাম, দুচোখে সুদূর প্রসারী উদাস দৃষ্টি, কাঁধে একটা ঝোলা আর হাতের একতারা আর খমক বাজিয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে তিনি নেচে নেচে গাইছেন "হৃদমাঝারে রাখবো", সুবর্ণা আর প্রীতি তন্ময় হয়ে শুনলো, মুগ্ধ হল। এতো সামনে থেকে এমনভাবে গান শোনার অভিজ্ঞতা ওদের এই প্রথম। বাবাজী বেশ সহজ মানুষ, ওদের সাথে আলাপ হল।ওরা টাকা দিল গান শেষ হতে। সুবর্ণা বাবাজীর হাতে আরো কিছু টাকা দিয়ে আরো একটা গান গাইতে বলল, তিনি কিছুতেই আর টাকা নেবেন না। ওদের

বাউল গানে এতো আগ্রহ দেখে তিনি ধরলেন লালন সাঁইয়ের একদম না-শোনা একটা গান,

“গুরু বিনে রইবো কেমনে,
গুরু হলেন অন্তর্যামী,
গুরু হলেন পরম দামী, জীবনে।
গুরু হলেন জ্ঞানপ্রদীপ,
গুরুই আবার মঙ্গলদীপ
গুরু ছাড়া আর কী আছে,কইব কেমনে?
গুরু হৃদে প্রেমের বাতি
গুরু ভগবানের জাতি
গুরু পরমের সাক্ষী ছাড়বি কেমনে?
এ জগতে গুরুই সার
মোক্ষপথের কর্ণধার
গুরু ছাড়া আর কী আছে, এ সংসারে বল দেখি?
বলেন লালন গুরুর চরণ পূজবি মনে মনে।”

আগে শোনেনি এ গানটা, কিন্তু এতো মনকাড়া সুর আর কথা যে গানটা যেন মনের মধ্যে বসে গেল ওদের। গান শেষ হতে সেই টাকাটা বাউল বাবাজীকে জোর করে দিতে দিতে ট্রেন ঢুকল নবদ্বীপে। নবদ্বীপে নামলো ওরা, সেই বাউল বাবাজিও নামলেন। ওদেরকে চেনা রিক্সা ধরিয়ে দিয়ে তিনি এগোলেন তাঁর মাধুকরীতে। বলে গেলেন এভাবেই ওঁর চলে, এখানেই কোনো আখড়ায় তিনি থাকেন, নির্লিপ্ত গলায় বললেন , “গোরা যেমন চালান সেভাবেই চলে যায়।” কত সহজে বললেন কথা কটা!!! সুবর্ণা আর প্রীতি দুজনেই আলোচনা করল ওঁর এই অদ্ভুত দৈবনির্ভর জীবনদর্শন।

সেই রিক্সাওলাও বলল, “খুব নির্লোভ মানুষ ওই বাবাজী।” ওদেরকে বেশ কিছু জায়গায় ঘুরিয়ে নিয়ে গেল পাতালদেবের আশ্রমে, ওরা ওখানে ঢুকে তাকে ছেড়ে দিল। সেই আশ্রমে প্রসাদ পেয়ে ওরা গেল পোড়ামা তলা হয়ে কৃষ্ণনগর। খুব ভালোভাবে ঘুরলো ওরা, ফেরার সময়ও কিন্তু গুনগুন করছে মনের মধ্যে মা-মেয়ের সেই সুর, “গুরু বিনে রইবো কেমনে।”

আরো কয়েক বছর পরে ওরা গেছে শান্তিনিকেতনে। সেখানে একটা ঘরোয়া গানের জলসায় বাউলরা এসে গান গাইছে। সুবর্ণা তাদের অনুরোধ করল “গুরু বিনে” গানটা শোনাতে। প্রীতি লক্ষ্য করল মায়ের এখনো মনে আছে ওই গানটা। তারা স্বীকার করল ওই গানটা তারা জানেনা। “হৃদমাঝারে রাখবো” তারা শোনালো অন্য অনেক গানের সঙ্গে যার মেঠো সুরও ভালো কিন্তু ওদের খালি মনে পড়ে ওই “গুরু বিনে রইবো কেমনে।” সুবর্ণা বলল, “আহা...বাউল গান শুনলেই কেন যে শুধু ওই গানটার কথাই মনে পড়ে!!! কী গানই শুনিয়েছিলেন নিমাইদাস বাবাজী!!”

হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে সুবর্ণা চলে গেল ঘুমের মধ্যে না-ফেরার দেশে। প্রীতি আর প্রীতির বাবা খুব ভেঙে পড়ল। সুবর্ণার অভাবটা কেউই মেনে নিতে পারেনা।প্রীতি এখন এম এ পাশ করে স্কুলে পড়াচ্ছে। সেবারে পৌষ সংক্রান্তিতে প্রীতি বাবাকে নিয়ে গেল জয়দেবের মেলায়, অজয়ের পাড়ে পরিচিত একজনে বাড়িতে ওরা উঠেছে তিনদিনের জন্য। জয়দেবের মেলা হল বাউল সম্মিলনী, সারাদেশের বাউলেরা এখানে আসে এই পৌষ সংক্রান্তির সময়। নদিয়া-বহরমপুর থেকে, বোলপুর-শান্তিনিকেতন থেকে, বিষ্ণুপুর, জয়রামবাটি, বীরভূম, নবদ্বীপ সব জায়গার বাউলেরা এসেছে এখানে।

বাবা মেয়েতে মিলে ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালো তারা রাধাবিনোদের আখড়ায়। সেখানে এক বাউল গাইছে শুনলো প্রথমে “হৃদ মাঝারে রাখবো”, সেটা শেষ হতে অন্য বাউল গান হল, ওরা উঠে আসবে আসবে মনে করছে সেইসময় একদম শেষে ওখানকার পদকর্তা ধরলেন “গুরু বিনে রইবো কেমনে”, বড়ো দরদ দিয়ে, হৃদয়ের আকুতি মিশিয়ে তিনি গাইছেন গানটা। শুনতে শুনতে প্রীতি একদম আপ্লুত হয়ে বসে পড়ল আখড়ার বারান্দায়, দুচোখের জল আর থামে না ওর। সব জমানো দুঃখ, স্মৃতি মিলেমিশে অশ্রু হয়ে ঝরতে লাগলো। ভেতরটা অজান্তেই “মা” “মা” করে আকুল হল ওর মনটা, অঝোরে কাঁদতে লাগলো ও, প্রীতির বাবারও চোখে জল। গান শেষ হতে প্রসাদ বিতরণের সময় সেই পদকর্তা এসে ওর মাথায় হাত রাখতে ও শান্ত হল একটু। বহুদিন পরে আবার এই গানটা ওকে যেন মিলিয়ে দিল ওর মায়ের সঙ্গে ওকে, সুর দিয়ে যেন ছুঁলো মাকে ও মনে মনে।

॥লোভের মরণ॥

সেনকাকিমার দুই ছেলে মেয়ে বুবলা আর বাবলা। মেয়ে বুবলা ছোট,ছেলে বাবলা বড়ো। ওদের বাড়িটা পাড়ার শেষে একদম ঝিলটা ঘেঁষে, ঝিলের পরেই মনুদের বিরাট আমবাগান আর বাঁশঝাড়।একই পাড়ার আরেক দিকে বাড়ি অরূপদের, অরূপ বাবলার ক্লাসে একই স্কুলে পড়ে। অরূপের বোন মৃত্তিকা আবার বুবলার বন্ধু। মিত্রবাড়ীর দুই ভাইবোনেরই অবাধ যাতায়াত আছে সেনকাকিমার কাছে, সৌজন্য বিনিময় আছে।

বুবলাদের বাড়িটা তিনতলা, বাগানে ঘেরা কিন্তু ওদের বারান্দায় সারাবছর রোদে দেওয়া বিভিন্ন আচারের বয়াম ভীষণ লোভের জিনিস অরূপের। রোজই দেখতে দেখতে পেরোয় ওদের বাড়ীর ওই আচারের বয়ামগুলো। আসলে সেনকাকিমা খুব ঘরোয়া আর মিশুকে, সারাদিন ব্যস্ত থাকেন রান্না, আচার, বড়ি, আমসত্ত্ব, পিঠেপুলি বানাতে, শুধুই বানান না, বাড়িতে কেউ গেলে খাওয়াতেও ভোলেন না। খুব ভালোবাসেন উনি লোকজনদের খাওয়াতে। তাই উনি খুব জনপ্রিয় পাড়াতে।

তুলনায় মিত্রকাকিমা মানে অরূপ মৃত্তিকার মা একটু মডার্ন বেশী, রান্নাবান্নার জন্য রান্নার লোক আছে, মিত্রকাকিমা সভা, সমিতি, পাড়ার ফাংশান, সাহিত্য বাসরে, বিউটি পার্লার নিয়ে বেশ ব্যস্ত থাকেন। তাঁকে তাঁর বাড়ীর লোকেই অল্প সময় পায়, এতো ব্যস্ত তিনি। কিন্তু তাও সেনকাকিমার সঙ্গে তাঁর ভালোই আলাপ আছে। যদিও সেনগিন্নির ওই গলে পড়া ব্যবহারটা তাঁর মনে হয় লোকদেখানো, কিন্তু তাঁর ছেলে মেয়ে দুজনেই খুব ভক্ত সেনকাকিমার।

বুবলা যখন নাইনে তখন বাবলা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সেকেন্ড ইয়ারে, অরূপ তখন এম বি বি এস সেকেন্ড ইয়ারে। দেখা গেল বুবলা লাইফ সায়েন্সে খুব কাঁচা। তাই অরূপকে সেনগিন্নি বললেন একটু দেখিয়ে দিতে বুবলাকে। অরূপ রাজী হল কারণ ও পড়ছে একই শহরের মেডিকেল কলেজে, যদিও চাপ আছে পড়ার তবু ও ম্যানেজ করে পড়াতে লাগলো। এমন সময় পাড়ায় ভীষণ চুরি আরম্ভ হল। পাড়ার যুবকরা দলবেঁধে নাইট পার্টির টহলদারি শুরু করল। যেহেতু সেনবাড়ি পাড়ার একদম শেষে, তাই ওদের ওখানেই বসার জায়গা ঠিক হল। টর্চ, লাঠি, নিয়ে ওরা পাহারা দেয় দলবেঁধে, ফ্লাস্কে চায়ের যোগান, সঙ্গে কাঁচের বয়ামে নিমকি, চানাচুর সব দায়িত্ব সেনগিন্নির। অরূপের জন্য রাত জাগে বুবলা, একে অরূপ ওকে পড়ায়, তাছাড়া দুজনের মনেই তখন অনুরাগের রং ধরেছে।বুবলাকে অরূপ বলে ওদের বাড়ীর সবচেয়ে বড়ো সম্পদ ওই আচারের বয়মগুলো। বুবলা হেসে খুন।

বুবলার মাধ্যমিক হয়ে যেতে ওরা বেড়াতে গেল দক্ষিণ ভারত। সেনবাড়ির পাহারার দায়িত্বে রইলো অরূপ আর ওর দুই বন্ধু স্বদেশ আর অর্ক। ওরা শোয় বাইরের ঘরে, সেই ঘরের লাগোয়া সেনবাড়ির ডাইনিং রুম আর টয়লেট, ওগুলো খোলাই আছে, ডাইনিং রুমের একপাশে বিরাট মিলসেলফে আছে কাকিমার সেই আচারের সম্ভার, সেই মিটসেল্ফটা খোলা আছে, কোনো তালাচাবি নেই তাতে। একদিন খুলে দেখলো অরূপ কুলের আচার, তেঁতুলের আচার, আমের আচার, লেবুর আচার, লঙ্কার আচার, সবজীর আচার সব মজুত

সেখানে, কোনোটা টক, কোনোটা মিষ্টি, কোনোটা নোনতা। আহা!.....এতদিনে এই আকাঙ্খার বস্তু হাতের নাগালে....অপেক্ষার অবসান। নেব না, খাব না করে করেও একটু একটু চাখলো প্রথমে, একবার করে চেখে দেখলো স্বাদগুলো সবকটার, একাই খেয়ে নিতে পারতো অরূপ, কিন্তু একটু বিবেকে লাগলো, যেটা করল সবচেয়ে ভালো লেগেছিল গুড় আম আর কুলের মিষ্টি আচার, ওগুলো আগে সরিয়ে রেখে আলাদা, একা একা একটু একটু করে সাবড়ালো। বাকিগুলো গুছিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বসে সাবাড় করে দিল ওরা ওই কয়েকদিনে। নিমকির বয়মের নিমকি মনে হল নেতিয়ে যায় যদি, সেগুলোও পেটে গেল। ফলে কয়েকদিন ধরে হাতের জল শুকলো না অরূপের আর ওর বন্ধুদের।

বুবলা, বাবলারা ফিরলে ওদের বাড়ীর চাবি বাবলার হাতে দিয়ে তিনবন্ধু সেই যে হাওয়া হল আর তাদের দেখা নেই। সেনকাকিমা বহুবার ডেকে পাঠালো বাবলাকে দিয়ে ওদের, কিন্তু অরূপ বা ওর বন্ধুরা কেউ ধারে পাশে মাড়ায় না। পাগল....ওদিকে যায় কেউ এখন !!!!

বুবলার রেজাল্ট বেরোল, লাইফ সায়েন্সে লেটার পেল, সেনকাকিমা আবার ডেকে পাঠালেন, অরূপ গেল না, ভীষণ অপরাধবোধ কাজ করছে ওর মধ্যে। ওদের বিশ্বাস করে বাড়ি ছেড়ে রেখে গেছিলেন কাকিমা আর ওরা ঐভাবে আচারের সর্বনাশ করেছে বলে নিজেদের বেশ অপরাধী লাগছে এখন। সেনকাকিমা কিন্তু এসে দেখেছেন ওই আচারের বয়ামগুলো খালি আর একদম ধোয়া। বুবলাকে দেখিয়েছেন সেগুলো কিন্তু উনি কিছুই মনে করেননি। বুবলার সঙ্গে দেখা করেছে পাড়ার বাইরে অরূপ, ওদের বাড়িতে যায়নি আর।

সেদিন পাড়ায় স্বাধীনতা দিবসের প্রোগ্র্যাম, বুবলা, মৃত্তিকা গাইবে, বাবলা আবৃত্তি করবে আর নাটকে অরূপ, বাবলা আছে। প্রোগ্র্যাম দেখতে সবাই এসেছে, সেনকাকু, সেনকাকিমাও এসেছেন। সব শেষে নাটক হয়ে যেতে অরূপদের অভিনয়ের সবাই প্রশংসা করছে, অরূপ দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে সেনকাকিমা এসেছেন সামনে।

কাকিমাকে দেখে অরূপ একদম স্পিকটি নট, কাকিমা বললেন, “হ্যাঁ রে, কাকিমাকে কেমন ভালোবাসিস যে একটু আচার খেলে আর কাকিমার সামনে দাঁড়াতে পারিস না? ওগুলোতো করাই ছেলেপুলেদের জন্য, খাবার জিনিস খেয়েছিস বলে এতো সংকোচ তোদের? আমি কী খুব কিছু বলতাম যে আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছিস?”

অরূপ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তুতলে বলল, “না, মানে, কাকিমা, আপনার এতো কষ্ট করে করা জিনিস আমরা একদম খেয়ে শেষ করে দিলাম।” বলে আমতা আমতা করছে, মাথা চুলকোচ্ছে।মুখটা ভীষণ করুণ অরূপের।

কাকিমা বললেন, “ওরে আচার যে ভীষণ লোভের জিনিস, ওই কাঁচের বয়ামের ভেতরে আচার দেখলেই জিভে জল আসে, আর সেটা হাতের নাগালে পেয়ে কেউ ছাড়বে নাকি? আমার বুবলা, বাবলাই ছাড়ে না, কত চোখে চোখে রাখতে হয় আমাকে ওগুলো, কিন্তু আচার তো খাবারই জিনিস। আমারই ভুল হয়েছে, তোদের বলে যাওয়া উচিৎ ছিল ওগুলো তোদের জন্যই রেখে গেলাম।” কাকিমার এই কথা শুনে বুক থেকে যেন একটা ভার

নেমে গেল অরূপের। ও ঢিপ করে একটা প্রণাম করে ফেলল কাকিমাকে আর কাকিমা আশ্বস্ত হলেন যে অরূপের আর সেই সংকোচটা রইলো না। তিনিও হেসে ওর পিঠে স্নেহের হাতটা রাখলেন।

॥বন্ধুত্ব॥

ছোট্ট নয় বছরের ক্লাস ফোরের মিঠি প্রকৃতি ভালোবাসে, গাছ, ফুল, আকাশ, সাগর এগুলো তার বিশেষ পছন্দ, একা একা ছাদে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ স্পর্শে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, একাত্ম হয়ে যায় যেন প্রকৃতির সাথে। খোলামেলা বাগান পুকুরে ঘেরা বড়োবাড়িতে সে থাকতে অভ্যস্ত, হাতে পায়ে খুব দুষ্টু সে নয়, কিন্তু এই বয়সের বাচ্ছা কখন কোনটা করে বসে আগের মুহূর্তে সে নিজেও জানেনা। খুব ছোট সে নয়, আবার বড়োদের মত পরিণতও সে নয়, কিছুটা ছেলেমানুষি তার আছে স্বভাবে আর সেটা মা বাবা একটু প্রশ্রয় দেয় কারণ বেশী পরিণত মানে তো ওদের ক্লাসের আর সব মেয়েদের মত পাকা হয়ে যাওয়া, যারা এই বয়সেই সবজান্তা, সব জানে বেশী। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে মিঠির এখনো বিস্মিত হয়, আনন্দিত হয়, এখনো সারল্য ওকে হয়তো অপরিণত রেখেছে, কিন্তু সাথে সহজ স্বচ্ছন্দও রেখেছে।

বাড়িতে মিঠি মা-বাবার আদরের চোখের মণি, কিন্তু যেহেতু ঠাকুমা, কাকা-কাকিমা, পিসি, পিসতুতো দাদাদের সঙ্গে একই বাড়িতে ওঠাবসা ওর, তাই শিশুমন ঠিকই জানে একমাত্র মা-বাবা ছাড়া আর কেউ তাকে বোঝে না, ভালোও বাসে না। অকারণে কাকিমা তার ঘর থেকে যখন তখন ওকে বের করে দেয়, অথচ খুড়তুতো বোন ওদের ঘরে বসে ওরই পুতুল নিয়ে খেলে, মা কিন্তু কিচ্ছু বলে না কখনো।

BANGLADARSHAN.COM

পিসিরা আসলে ঠাকুমার ঘরে ঢোকা ওর কাছে অনধিকার প্রবেশ হয়ে যায়, ওকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গেলে পিসি ওকে আইসক্রিমের অর্ধেকটা দেয়, বার বার মনে করায় ওর মা বাড়িতে নেই বলে ওকে ওরা সঙ্গে এনেছে, ছেলেমানুষ মিঠি বেড়ানোর আনন্দে ওদের সঙ্গে গিয়ে ফেরে একরাশ মনখারাপ নিয়ে। আর ঠাকুমা যে যখন সামনে থাকে তার হয়ে কথা বলে, পিসি সামনে থাকলে পিসির, কাকিমা সামনে থাকলে তার আর ও সামনে থাকলে ওর মাকে নিয়ে বাজে কথা বলতে থাকে যেহেতু মায়ের চাকরি করাটা ওর ঠাকুমার অপছন্দ।

মিঠি কনভেন্ট স্কুলে যায়, পড়াশোনাও করে কিন্তু সহজতার সরলতার মাসুল হিসেবে অনেকবার স্কুলে হেনস্থা হয়েছে টিচার আর বন্ধুদের হাতে, তাই সঙ্গ জিনিসটা সে এড়িয়ে চলে, সঙ্গ ওর অশান্তি বাড়ায়, সরলতা কেড়ে নেয়। নিজের মত স্কুলে আসে, পড়াশোনা কিছুটা করে, কিছুটা করে না, টিফিন একে ওকে দিয়ে দেয়, মোট কথা খুব একটা আনন্দের সঙ্গে সে স্কুলে যায় না। তার অতলান্ত অপেক্ষা থাকে সকাল থেকে সন্ধের জন্য, কখন মা ফিরবে অফিস থেকে, কখন মায়ের কোলঘেঁষে বসে মায়ের গায়ের 'মা' 'মা' গন্ধ নিতে নিতে চা খাবে, খাবার খাবে, সর্বোপরি আদর খাবে। তার মানে এই নয় যে মা দুচার ঘা দেয় না, দেয়, দেয় ওর ক্লাস ওয়ার্কের খাতা অসমাপ্ত থাকলে বা স্কুলের টিচারদের ডাইরিতে কোনো কমেন্ট থাকলে কিন্তু তার পরেও মা-ই ওর এক এবং একমাত্র আশ্রয়স্থল, বন্ধু। বাবা সকাল আটটায় অফিসে বেরিয়ে ফেরে সেই রাত দশটা এগারোটায়, আই টির চাকরি তো এমনই হয়, তাই বাবার সঙ্গে একমাত্র ছুটির দিন ছাড়া তেমন কথাই হয় না, তারওপর বাবার মাসের মধ্যে কুড়ি দিন ট্যুর থাকে, তাই বাবাকে তেমন পায় না মিঠি।

সেবারে অগাস্ট মাসে পরপর কয়েকদিনের ছুটি হল স্কুলে, পনেরোই আগস্ট আর শনি-রবিবার মিলে আরো

তিনদিন, মা বাবাকে রাজী করিয়ে ওরা ঠিক করল কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসবে। মা ঠিক করল শান্তিনিকেতন যাবে। মিঠির আপত্তি ছিল একটু কারণ ও একদম খোলা প্রকৃতির কোলে যেতে আগ্রহী, মা বলল "গিয়েই দেখ, কেমন লাগে।" সেই মত ট্রেনের এবং শান্তিনিকেতনের গেষ্ট হাউসে থাকার বুকিং করা হল। ওরা ভোরের রামপুরহাট এক্সপ্রেস ধরে গিয়ে পৌঁছলো এগারোটা নাগাদ। এই হঠাৎ পাওয়া ছুটি মানে বইখাতার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এ'কদিন, মাকে আর বাবাকে পুরো সময় পাওয়া যাবে। মা আর বাবাও যেন ওরই মত ছোট হয়ে গেছে, তাদেরও অখণ্ড অবসর, শুধুই ঘোরার আনন্দ। আসলে সবসময় কাজ আর কাজ করতে করতে ওরাও ক্লান্ত, একটুকরো ছুটির অবসর ওদেরও খুব আকাঙ্খার।

ওদের থাকার জন্য যে ভুবনডাঙার মনোরমা গেষ্ট হাউসে ওদের বুকিং সেটা বেশ ভালো, সামনে, পেছনে ফুলে ফুলে ভরা বাগানে কত ফুল, যেহেতু বর্ষাকাল সবুজে সবুজে ছেয়ে আছে চারিদিক। গেষ্ট হাউসের সামনেই টোটো স্ট্যান্ড। সেখান থেকে টোটো নিয়ে ওরা বিশ্বভারতীর ভেতরে "শান্তিনিকেতন ঘর" যেটা আসলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি সেটা দেখলো, ছাতিমতলা, রবীন্দ্রভবন, রবীন্দ্রনাথের বাড়ি উদয়ন, উদিচি, শ্যামলী বাড়িগুলো দেখলো, মিউজিয়াম দেখলো দুদিন ঘুরে ঘুরে। মা বলল উদয়নের সামনের গোলাপ বাগান দেখে লেখা রবিঠাকুরের "বলিও আমার গোলাপবালা" গানটা। সেই আম্রকুঞ্জের মাঝে লাগানো বিরাট ঘন্টা দেখে ওর বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না। ওখানে মাঠে ঘাটে যত্রতত্র বাউলদের আনাগোনা, গান গাওয়া ওকে একেবারে মুগ্ধ করে দিল। সবুজের সমারোহ আর খোলা নির্মল আকাশ, বিশুদ্ধ বাতাস ওকে যেন দুহাত বাড়িয়ে টেনে নিল বুকেতে। এই বয়সে দুচোখে মাখানো থাকে যে বিস্ময়ের কাজল আর নতুন কিছু দেখার ভালোলাগার আবেগ, তাতে মিঠি ভেসে গেল। মা আর বাবারও যেন আনন্দ উপচে পড়ছে চোখে মুখে, সবারই কাজ থেকে কয়েকদিনের ছুটি, মায়ের অফিস নেই, রান্না নেই, ওকে পড়ানো নেই, বাজার করা নেই, অকারণে ঠাকুমার কথা শোনানো জন্য মনখারাপ নেই। বাবারও অফিস নেই, কনকল নেই, ক্লায়েন্ট মিটিং, ডেডলাইনের তাড়া নেই, নিরবিচ্ছিন্ন অবসর সবারই। বাবা সঙ্গে ভায়োলিন এনেছে, ঘোরা ফেরার ফাঁকে ফাঁকে বাজাচ্ছে। মা বই এনেছে, পড়ছে কখনো ওকে নিয়ে বসে অন্তাক্ষরী খেলছে, কবিতা বলছে, যে যার মত করে সময় কাটাচ্ছে, ওও হ্যারি পটারের দুটো বই এনেছে, কিন্তু এতো বুঁদ হয়ে আছে প্রকৃতিতে যে সে দুটো সামান্যই পড়া হয়েছে ওর।

একদিন ওরা গেল কঙ্কালীতলা, সেখানে কোপাইয়ের পাড় ঘেঁষে বিস্তীর্ণ সবুজ উন্মুক্ত ক্ষেত, কোপাইয়ের জলধারা, বড়ো বড়ো পাথর ছড়ানো কোপাইয়ের পাড়, গাছ গাছালি দিয়ে ঘেরা কঙ্কালীতলা এসব ওকে মুগ্ধ করল, মা ওকে দেখালো এই কোপাই দেখেই রবিঠাকুরের লেখা 'আমাদের ছোট নদী' কবিতাটা, দেখে ফিরে এলো ওরা গেষ্ট হাউসে।

পরেরদিন গেল সেই খোয়াইয়ের কাছে সোনাঝুরিতে হাট দেখতে। ওখানে হঠাৎ মিঠি দেখে মা কার সঙ্গে খুব গল্প করছে, ও তখন ওখানে বাবার সঙ্গে কাঁচামিঠে আম খেতে ব্যস্ত ছিল, মায়ের ডাকে ওরা মায়ের কাছে যেতে মা পরিচয় করালো মায়ের ছোটবেলার বন্ধু কাঞ্চন মামুর সাথে। কাঞ্চন মামু থাকে বোলপুর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে বাহিরি গ্রামে, ওখানেই ওদের বাড়ি। কাঞ্চন মামু এসেছে সোনাঝুরি হাটে হাতে তৈরী

কাঁথাস্টিচের ব্লাউস পিস বিক্রি করতে যেটা কাঞ্চনমামুর বৌ বানায়। কাঞ্চনমামু সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে নিয়ে চলল ওর বাড়িতে একটা টোটো ডেকে।

কাঞ্চনমামুর বাড়িটা ঠিক সেই বইয়ে পড়া গ্রামের বাড়ীর মতন, খড়ের চাল, কিছুটা মাটি, কিছুটা ইঁট দিয়ে করা দেয়াল, কাঞ্চনমামুর একটা ওর বয়সী মেয়ে আছে, টিয়া, সে খুব বন্ধু হয়ে গেল মিঠির। সে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওকে ওদের ধানের মড়াই, ধানসেদ্ধ করার মাটির উনুন, কুঁয়ো যেখানে দড়ি বালতি নামিয়ে জল তুলতে হয় আর কী ঠান্ডা আর মিষ্টি জলটা,ওদের গরুর গোয়াল, সেখানের চারটে গরু, তাদের দুটো বাছুর,ওদের বাড়ীর বকুল গাছ, স্বর্ণচাঁপা গাছ, শিউলি গাছ, পেয়ারা গাছ, কুলগাছ, আমগাছ দেখালো। কাঞ্চনমামুর মা যে মিষ্টিদিদা আর কাঞ্চনমামুর বৌ পরীমামী ওরা মিঠিকে খুব আদর করল। দুপুরে জোর করে ওদের বাড়িতে মিষ্টিদিদা আর মামীমা ওদেরকে পুকুরের মাছ, ক্ষেতের চালের ভাত, ঘরে পাতা দই,ঘরের মুরগির ডিমের ওমলেট, চাষের ক্ষেতের আলু, আনাজ এসব দিয়ে নিজেরা রান্না করে খাওয়ালো আর আসার সময় ঘরে বানানো নাড়ু, মোয়া, তক্তি, আমসত্ত্ব সঙ্গে দিয়ে দিল ও খাবে বলে, মাকে দুটো নিজের হাতে করা ব্লাউস পিস দিল পরীমামী । মিঠি অবাক হয়ে দেখলো ওর মাকে আজও কত ভালোবাসে কাঞ্চনমামু, মিষ্টিদিদা, ওর মায়ের প্রশংসায় কাঞ্চনমামু আর ওই মিষ্টিদিদা ওরা একবারে পঞ্চমুখ। ওকে বারবার বলল যে ওকে বড়ো হয়ে ওর মায়ের মত হতে হবে। মিঠির মা বড়ো সরকারি অফিসার, নিজের যোগ্যতায় পরীক্ষা দিয়ে পাওয়া চাকরি মিঠির মায়ের। কাঞ্চনমামু মিঠির মায়ের ফোন নম্বর নিল, মিঠির মাকে বাবাকে বার বার থেকে যেতে বলেছিল সেদিনটা কিন্তু ওদের সেদিনই বিকেলের ট্রেনে ফেরার কথা, টিকিট করা আছে তাই ওরা চলে এলো, মা-বাবাও বার বার টিয়াকে নিয়ে, মামীকে নিয়ে, মিষ্টিদিদাকে নিয়ে আসতে বলে এলো ওদের কলকাতার বাড়িতে।

গেষ্টহাউসে এসে কোনোরকমে গোছগাছ করে ওরা ছুটলো বোলপুর স্টেশনে। সেখানে এসে দেখে কাঞ্চনমামু টিয়াকে নিয়ে স্টেশনে এসেছে ওদের জন্য রাতের খাবার বানিয়ে । ট্রেনে ওদের তুলে দিয়ে ট্রেন যখন ছাড়ছে মিঠির আর টিয়ার দুজনেরই চোখে জল, যে মিঠি স্কুলে সঙ্গ এড়িয়ে চলে তার কষ্ট হচ্ছে টিয়াকে ছেড়ে যেতে। কয়েক ঘন্টার আন্তরিকতা বেঁধে ফেলেছে ওকে টিয়ার সঙ্গে সহজ সখ্যতায়।শেষে পুজোর ছুটিতে কদিন টিয়াকে নিয়ে কাঞ্চনমামুরা আসবে এই প্রতিশ্রুতি দিতে দুজনে সজল চোখে হাত নাড়তে লাগলো, ট্রেন স্পিড নিতে আস্তে আস্তে ওরা দৃষ্টি পথের বাইরে চলে গেল। মিঠির মনে হল এইবারের ছুটিটা ওর সবচেয়ে ভালো কাটলো।ট্রেনের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরও মনখারাপ হচ্ছে। আবার সেই স্কুল, সে বাড়ীর পরিবেশ, সেই পড়াশোনা, আবার চরম ব্যস্ততা মায়ের আর বাবার, এই প্রাণখোলা, দিলদরিয়া মেজাজটাই হারিয়ে যাবে আবার।

তবে মা ছাড়া ওর একটা প্রাণের বন্ধু হল, যাকে কলকাতায় ফিরে এসেও ও সময় করে মায়ের ফোন থেকে ফোন করে কথা বলবে, গল্প করবে, যার সঙ্গে নিজের সুখদুঃখ ভাগ করা যাবে । মায়ের যেমন কাঞ্চনমামু এতো ভালো বন্ধু আজও, ওরও টিয়া তেমন অকৃত্রিম একটা বন্ধু হল এবারের ছুটিতে, এটাই ওর এবারের ছুটির প্রাপ্তি।

॥প্রার্থনা॥

তিতলির ফিরতে দেরী হবে অফিস থেকে, তিনবছরের মেয়ে বনির পরীক্ষা চলছে,তাই নীলু পড়াতে বসেছে সেদিন বনিকে। তিতলি ঢুকতেই বনি অনুযোগ করল, “মা তুমি বাবাকে কেন পলাতে দিয়েছো, বাবা কী লেখাপলা জানে যে পলাবে?” তিতলি হেসে অস্থির।

সেদিন বনির নার্সারী থেকে কেজিতে ওঠার রেজাল্ট। আগেরদিন সন্ধেবেলায় নীলু মেয়েকে নিয়ে গেলো সামনের কালীমন্দিরে পুজো দিতে। প্রথম ক্লাসে ওঠার রেজাল্ট মেয়েটার, একটু মায়ের আশিস নিয়ে নিতে চাইছিল আর কীপুজোর ডালা কিনে বনির হাত দি !!য়েই দেওয়ানো করালো ঠাকুরমশাইকে। ঠাকুরমশাই নাম গোত্র জেনে নিয়ে পুজো দিচ্ছেন নীলু বনিকে বলল, “হাত জোড় করে মায়ের কাছে নমো করো।” বেরোনোর আগে তিতলি বলে দিয়েছে মাকে কী বলতে হবে। বনি তিতলির শেখানো ওর জন্য কথাগুলো সেইমতো হাত জোড় করে জোরে জোরে বলতে লাগলো মন্দিরে, “থাকুল বাবাকে বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও, সুমতি দাও, ছাহস দাও,যেন মনটা ছান্ত থাকে, চঞ্চল না হয়, বাবাকে দেখো থাকুল, ওকে ভালো রেখো।” বনির পাশে চোখ বুজে নীলুও দাঁড়িয়ে প্রণাম করছিলো। সে প্রণাম শেষে আশেপাশে তাকিয়ে দেখে সবাই ওকে দেখছে আর মুচকি মুচকি হাসছে। নীলু বনির প্রার্থনা করা দেখে বিমূঢ় হতচকিত। তাড়াতাড়ি নিলুকে কোলে তুলে বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে ভাবে মেয়েরা তো কুমারী পার্বতী,মা দুর্গারই আরেক রূপ।

॥মিলন॥

কদিন ধরে অসম্ভব ভ্যাপসা গরম চলার পরে সেদিন রাতে বৃষ্টি শুরু হলো। সম্বন্ধ করে হওয়া তিন বছরের বিবাহিত অনুত্তমা বর নিখিলেশকে দেখছে বিয়ের পর থেকে আদ্যন্ত কাঠখোট্টা একজন গম্ভীর সরকারি আধিকারিক হিসেবে, রসকসহীন কেজো প্রাকটিক্যাল লোক হিসেবে। পরেরদিন ওদের যাবার কথা অনুত্তমার বাপের বাড়ি বিষ্ণুপুরে। ভোরে গাড়ি নিয়ে বেরোল দুজনে। সবে বৃষ্টিটা ধরেছে। আকাশ ছেয়ে আছে কালো মেঘের ঘনঘটায়। বাইরেটা ভারী মনোরম।

দুর্গাপুর থেকে ঘন্টা চারেক লাগবে গাড়িতে। দুজনেই যেহেতু কর্মরত তাই ওদের যাওয়াটা খুব বেশী ঘটে ওঠে না। এবারে অনুত্তমার দাদা অনুভব বিদেশ থেকে এসেছে অনেকদিন পরে বলে তার সাথে দেখা করার জন্য যাওয়া। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখন দুর্গাপুর ব্রিজ পেরোচ্ছে আবার নামলো বৃষ্টি, ব্রীজের ওপরে দামোদরের জল যেন আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে, উদ্দাম কলকল বেগে ধেয়ে চলেছে সে দুকুল ছাপিয়ে। আকাশের পরতে পরতে মেঘের সাজ, গুরুগুরু মেঘের গম্ভীর ধ্বনি, বিদ্যুতের ঝলকানি সব মিলে সেজেছে নববর্ষা। অনুত্তমার বড়ো প্রিয় বর্ষা। মনটা যেন বৃষ্টি দেখে ময়ূরের মত নেচে উঠছে পেখম মেলে। আরেকটু এগোতেই মেঠো জলে ডুবে যাওয়া ক্ষেত, বর্ষার শীতল স্নিগ্ধ জলে আস্নাত গাছপালা, বৃষ্টির ফোঁটা লেগে থাকা ফুলপাতা, বৃষ্টির তোড়ে ঝাপসা খড়ের চালের মাটির বাড়ি, লালমাটির ভিজে রাস্তা দেখে অনুত্তমার মনে পড়ছিল স্কুলজীবনের হারানো দিনগুলো। গাড়ির জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বৃষ্টির জল ধরছে হাতের তালুতে।

এদিকে স্বভাবগম্ভীর নিখিলেশের চোখে মুখেও আজ ভারী পরিতৃপ্তির ছাপ। সেও ভাবছিল তাদের জেবিয়ের্সের সেই জলেডোবা বিশাল ঘাস আর চোরকাঁটায় ভরা কম্পাউন্ড, জানলা দিয়ে দেখা দূরের বৃষ্টিতে ভিজতে থাকা গাছপালা, আলোছায়া মাখা ভিজে ভিজে বাতাসের গন্ধ, স্কুল থেকে ফেরার সময় ইচ্ছে করে জমাজলে লাফিয়ে জুতোমোজা ভিজিয়ে বাড়ি ফেরা, বাড়িতে বর্ষণসিক্ত সেসব দিনে মায়ের হাতের সেই অমৃতের স্বাদের খিচুড়ি। নিখিলেশের হঠাৎ মনে হলো তাদের সেই দিনগুলোতে প্রাচুর্য ছিল না, কিন্তু বড়ো আনন্দ ছিল। মনে পড়ল বাবার মুখে আওড়ানো বৈষ্ণব পদাবলীর “ঝরঝর বাদর অথিরত বিজুরি এ ভরা ভাদর” পদ আর মায়ের গুনগুন করে গাওয়া “আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।” মা বাবার ওই পদাবলী আর গানে তাঁরা- নিজেদের অন্তরের মিল কত সুন্দর মেলে ধরতো মুখে ভালোবাসি না বলেও ছোট ছোট ঘটনায় নিজেদের !!! সাহচর্য যে তাঁরা উপভোগ করছে বোঝা যেত।

তার অনুত্তমার সঙ্গে বিবাহিত জীবন সুখের কিন্তু নিখিলেশের অটুট গাম্ভীর্য তার সঙ্গে উচ্ছল অনুত্তমার একটা অলিখিত দূরত্ব আর গন্ডি টেনে আলাদা করে রেখেছে। তারা দম্পতি হলেও বন্ধুত্ব হয়নি আজও তাদের। অনুত্তমা অনেকবার চেষ্টা করেছে এই গন্ডিটা টপকাতে কিন্তু নিখিলেশের জন্যই অতিক্রম করতে পারেনি সে। ব্যথিত অনুত্তমা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। আপাতভাবে তারা সুখী হলেও একটা ব্যবধান রয়ে গেছে তাদের দুজনের মধ্যে। দেখতে দেখতে তারা বাঁকুড়ায় ঢুকলো। সেখান থেকে অনুত্তমা ভালো মিষ্টি নিল, ফল কিনল মা বাবার জন্য। তাড়াহুড়োয় সেগুলো নেওয়া হয়নি আগে দুর্গাপুর থেকে, বাঁকুড়ার বিখ্যাত চিত্তরঞ্জন কেনা হল

অনুভবের জন্য।

আস্তে আস্তে গাড়ি এগোলো বিষ্ণুপুরের দিকে। বিষ্ণুপুরে ঢোকার ঠিক আগে পড়ে দ্বারকেশ্বর নদ। সেই নদ বর্ষার জলসিঞ্চন একেবারে ভীমবেগে ছুটে চলেছে। নদের তীরঘেঁষে বিরাট শালবনের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা গেছে সাঁওতাল পল্লীর দিকে, সেটা বর্ষার জলে কর্দমসিক্ত। শালগাছগুলো বৃষ্টির জলে স্নান করে একেবারে স্নিগ্ধ শ্যামল চকচকে। এখানে গাড়ি থামালো নিখিলেশ। অনুত্তমার বৃষ্টিতে ভেজার একটা অদম্য ইচ্ছে হচ্ছিল অনেকক্ষন ধরে, কিন্তু আবার নিখিলেশ কী ভাববে এই চিন্তায় গাড়িতে চুপ করে বসে রইল। নিখিলেশকে আজকে বর্ষার এই বাতাবরণ মনে করালো কালিদাসের মেঘদূতকে, সে বিরহী যক্ষ হতে চায় না, সে প্রেমিক বন্ধু হয়ে প্রিয়াকে সাথী করে এগোতে চায়-সখা-জীবনে। তাই অনুত্তমাকেও হাত ধরে নামালো আর গেয়ে উঠলো,

'তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাতিয়া
মত্ত দাদুরী, ডাকিছে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঙাইবি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।'.....

আকস্মিক সাদর সম্ভাষণে অনুত্তমা হকচকিয়ে গেলেও এই ব্যবধান ঘুচে যাওয়ায় সেও মেতে উঠলো সানন্দে ধারাস্নানে প্রিয়সঙ্গে, সেও ধরল ভানুসিংহের পদ, "শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা"....প্রিয়াসঙ্গের বর্ষামঙ্গলে মিলন হলো এতদিনে প্রিয়র আবেগীমনের আগলভাঙা উচ্ছ্বাসের।

॥রুদ্রাক্ষের মালা॥

বেশ কিছুদিন ধরে নর্মদা পরিক্রমা করছে সুব্রত। গতবছর পুজোয় সে শুরু করেছে নর্মদা উদ্গম অমরকণ্টক থেকে দক্ষিণতট ধরে পরিক্রমা, টানা ছয়মাস চলার পরে আটকে গেল মধ্যপ্রদেশের একদম সীমানায় এসে লকডাউনের কারণে। সেখানে নর্মদা কিনারে দত্তাবাদ বলে একটা আশ্রমে আশ্রয় মিলল। সুব্রত নিজেও সিদ্ধ অবধূত গুরুর আশ্রিত, আশ্রয় মিলল যেখানে সেই আশ্রমের কর্ণধার প্রবুদ্ধানন্দ সরস্বতী সিদ্ধসন্ত। তিনি ওকে আশ্রয় দিলেন আর সুব্রত দায়িত্ব নিল ওঁর আশ্রমের কিছু নির্মাণের কাজের, কারণ এই কাজে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে। সেই আশ্রমে থাকাকালীন তার দর্শন হলো দশমহাবিদ্যার যেমন মাতঙ্গী, বগলামুখী, ধুমাবতী, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি বিভিন্নরূপের জন্য করা হোমের, কারণ সন্তজী একজন উচ্চকোটির তান্ত্রিক। সন্তজী সুব্রতর মধ্যে কী দেখেছিলেন তিনিই জানেন। তিনি সাধন পথের নানান জিনিস হাতে ধরে ওকে শেখাতে লাগলেন। লকডাউন বাড়ায় সুব্রত বেরোতেও পারছে না। দেখতে দেখতে সুব্রতর তদারকিতে আশ্রমে পাহাড়ের মাথা থেকে জলের কানেকশন হলো, দশমহাবিদ্যার সাধনের বেদী হলো, মন্দিরটা সংস্কার হলো। এদিকে পথে নামার জন্য সে অস্থির হয়ে গেছে ততদিনে, প্রায় দেড় মাস কাটলো।

একদিন রাত্রে সে সন্তজির কাছে অনুমতি চাইলো পরেরদিন আবার পথে নামার, বৃদ্ধ সন্তজী প্রথমে আপত্তি করলেও ওর পরিক্রমার ব্রতর গুরুত্ব বুঝে অনুমতি দিলেন। এই পথের গোটাটাই যে দৈবের ভরসায় চলতে হয়, তাই উনি রাজী হচ্ছিলেন না। পরেরদিন ভোরে উঠে স্নান পুজোপাঠ সাঙ্গ করে সুব্রত গেল অনুমতি চাইতে বিদায়ের ওঁর কাছ থেকে। ওঁকে প্রণাম করতেই মোহমায়ামুক্ত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী কাঁদতে লাগলেন ওকে জড়িয়ে ধরে, শেষে ওকে দিলেন সোনার তার দিয়ে গাঁথা একদম সুব্রতর জন্য জপ করে সিদ্ধ করে দেওয়া রুদ্রাক্ষের মালা যেটা ওকে পথের বিপদ থেকে রক্ষা করবে আর বারবার বলে দিলেন পরিক্রমা শেষ করে তাঁর কাছে চলে আসতে। এবারে সুব্রত ওঁর পা জড়িয়ে কাঁদতে লাগলো, শেষে ওঁর আশীর্বাদ নিয়ে আবার পথে নামলো।

পথে নেমে প্রথম কয়েকদিন বেশ অনেকটা এগোলো। এবারে এগোতে এগোতে এলো নর্মদা পরিক্রমার সবচেয়ে বিপজ্জনক অংশ শূলপানি ঝাড়ি। একটানা অনেকটা রাস্তা বিপদসংকুল জঙ্গল আর পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা, হিংস্র জন্তুজানোয়ার আছে, পাহাড়ী উপজাতি আছে যারা জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয়। প্রথম দুদিন ভালোই কাটলো, তৃতীয় দিন অতিরিক্ত গরমে তার হিট স্ট্রোক হয়ে গেল। দুটো দিন একটা শিবমন্দিরে শুয়ে থেকে একটু সুস্থ হয়ে আবার এগোতে লাগলো।

আবার দুটো দিন পরে গরম লেগে অসুস্থ হলো, এবারে সঙ্গে এমন পেটের গন্ডগোল হলো যে রক্ত পড়তে লাগলো নাক দিয়ে অতিরিক্ত গরমে। মধ্যপ্রদেশের ঐসব অঞ্চল এমনিতেই শুকনো, তার মধ্যে ওখানে একটু বেলা বাড়লেই লু বইতে থাকে। এমন অসুস্থ হলো যে টানা বারোদিন যমে মানুষে টানাটানি করে মরতে মরতে বাঁচলো। স্বজনহীন নির্বান্ধব বিদেশে যখন মৃত্যুর জন্য দিন গুনছে, দুজন সন্ন্যাসী তুলে নিয়ে গেল ওকে, শুশ্রূষা

করে ডাক্তার দেখালো, ডাক্তার ইনজেকশন দিলেন, ওআরএস দিলেন, সেগুলো খেয়ে একটু সুস্থ হতে প্রথমেই ওর মনে হলো সন্তজির কথা, এই জন্যই কী উনি আগাম ওর সুরক্ষার জন্য ওই মালাটা দিয়েছিলেন? পরম শ্রদ্ধায় সুব্রত মাথায় ছোঁয়ালো ওই রুদ্রাক্ষের মালাটা।

॥অন্ন বিনিময়॥

তৃষিতার বর অচিনের করোনা হয়েছিল, দিনে আঠারো কুড়ি বার লুজ মোশনের জেরে বাথরুমে যাওয়া, তার সঙ্গে ঘাড়ে কোমরে ব্যথা আর জ্বর। অবস্থা দেখে সকলে বলেছিলো হাসপাতালে দিতে কিন্তু একপ্রকার নিজের জেদ আর শুশ্রূষার জোরে তাকে যখন সারিয়ে এনেছে তখন হঠাৎ তার ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে একদম চলোৎশক্তিরহিত করে দিল যন্ত্রনায়, তার সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রনায় রাত্রে ঘুমোতে পারছে না। তার জন্য ওয়াকিং স্টিক কিনে আনলো তৃষিতা, বাথরুমে বসে চান করার জন্য ফাইবারের টুল। এমন সময় হঠাৎ তৃষিতা দেখলো ওর নাকে গন্ধ আসছে না, জ্বর এলো, ডাক্তার দেখে টেস্ট করে দেখা গেল ওরও করোনা। এদিকে মেয়ের অনলাইন ক্লাস চলছে, তারও করোনা, সেও গন্ধ পাচ্ছে না, জ্বর আছে। এরমধ্যে লকডাউন ঘোষণা হলো। কাজের লোকের আসা বন্ধ হলো। সব কিছু পড়ল একা তৃষিতার ঘাড়ে, দুর্বিসহ অবস্থা। হার না মানা জেদে তৃষিতা সব সামলাতে লাগলো নিজের শরীরের তোয়াক্কা না করে।

এমনি একদিন বড্ড রোদ, ভীষণ গরম, সকাল আটটাতেই পুড়ে যাচ্ছে চামড়া। সকালে বাজারে গিয়ে ফল কেনার সময় একটা বৌ এসে দাঁড়ালো কোলে একটা বছর দুয়েকের বাচ্ছা নিয়ে তৃষিতার সামনে, তাকে দশটা টাকা দিল তৃষিতা। একটু এগিয়ে আবার সব্জি কিনছে আবার মেয়েটা এসে হাত পেতে দাঁড়ালো। তৃষিতা টাকা দিয়ে মেয়েটাকে কচুরি তরকারি কিনে দিল, তারপর জিজ্ঞেস করল এতো রোদে বাইরে ওই দুধের শিশু নিয়ে বেরিয়েছে কেন। সে বলল তার বর মুম্বাই গেছে কাজে, ঘরে শাশুড়ি, আরো দুটো বাচ্ছা, ননদ, আর ঘরে একদানা খাবার নেই। তাই ভিক্ষে করা ছাড়া রাস্তা খোলা নেই। তৃষিতা মাছ কেনার জন্য পাঁচশো টাকা রেখেছিলো, সেটা দিয়ে বলল “এতে কটা দিন চলুক তোমার।” ফেরার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গেল মেয়েটাকে তৃষিতার বাড়ির পাশের বিধায়কের কাছে, তিনি আশ্বাস দিলেন ব্যবস্থা করবেন ওই পরিবারের। বাড়িতে ডিমের ঝোল, ভাত করে সেদিন দুপুরে খেতে বসে তৃষিতার মনে পড়ল ওই বৌটার কথা। একটু আনন্দ হলো যে ওর দুদিনের মাছের টাকায় কোনো পরিবারের মুখে অন্ন উঠল। তৃষিতার মেয়ে আর বরও দিব্যি খেয়েও নিল ওই খাবার, আসলে ওদের তখন মুখে কোনো রুচিই নেই, শুধু পেট ভরাতে খাচ্ছে, তৃষিতারও তাই। কিন্তু তার শরীর ভেঙে পড়ছে ক্লান্তিতে কারণ ওরা দুজন শুয়ে বিশ্রাম নিতে পেরেছে, তৃষিতা সেটা একদম নিতে পারেনি।তবুও আজকে ওর মনে একটা তৃপ্তি আছে, অন্ততঃ নিজের সামর্থে কারুর একটু কাজে লাগতে পেরেছে ও।

॥অভাবনীয় প্রাপ্তি॥

পুরীতে অফিসের গেষ্টহাউসে এসেছে পর্ণা আর প্রণব তিন বছরের মেয়ে ঝুনাইকে নিয়ে দিন দুয়েক, গেষ্ট হাউসটা চক্রতীর্থে। প্রণব আর পর্ণা একই তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত, কিন্তু প্রণবকে সারাভারতের তাদের অন্য অফিসগুলো আর প্রণবের পাড়া চেনে ওর সঙ্গীত প্রতিভার জন্য। অথচ অন্তর্মুখী প্রণব ভীষণ প্রচারবিমুখ, কোথাও নিজের থেকে বলে না ওর এই গুণের কথা। পর্ণার সঙ্গে বিয়েটাও তার ওই বাজনার জন্য, প্রণব বেহালা, পিয়ানো, সেতার, গিটার সবগুলো যন্ত্রই ভীষণ ভালো বাজায়, বাড়িতে রীতিমতো ষ্টুডিও আছে ওর কিন্তু শেখাটাকেই এখনো বেশী প্রাধান্য দেয় ও। পুরী আসলে সঙ্গে আসে বেহালা, সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের সাথে মিলেমিশে যায় ওর সুরের মূর্ছনা। নির্বিচ্ছিন্ন অবসরে শুধুই বাজনা আর পরিবারকে সঙ্গ দেয় ও।পর্ণাও গান গায় তাই ও পছন্দ করে প্রণবের এই সুরের সাধনা। ওরও তাতে সাধনাটা বজায় থাকে।

গেষ্টহাউসের সামনে সীবিচে কয়েকদিন ধরে দেখছে ওরা জনা পনেরো ছেলে বসে থাকে সকালসন্ধে-, কেয়ারটেকার বৈকুন্ঠ বলল ওরা ওখানে বসে নেশা করে। সেদিন প্রণব বাজাচ্ছে এমন সময় বৈকুন্ঠ এসে ডেকে নিয়ে গেল প্রণবকে। ওই ছেলেগুলো এসেছে প্রণবকে ওদের কলেজ ফেস্ট পরেরদিন, সেখানে গিয়ে বাজানোর আমন্ত্রণ জানাতে, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে কালচারাল সেক্রেটারি আর ভাইস প্রিন্সিপালকে। বৈকুন্ঠ বলে দিয়েছে পর্ণার ভালো গান গাওয়ার কথা। পর্ণা আর প্রণবের আপত্তি সত্ত্বেও ওদের আগ্রহে আর সনির্বন্ধ অনুরোধে রাজী হতে হল ওদের।

কোনো রিহার্সাল নেই, কিভাবে কী হবে ভেবে সংকুচিত ওরা, ওই ছেলেগুলোই সহযন্ত্রীদের জোগাড় করল রাতারাতি। পরেরদিন সারা সকাল রিহার্সাল দিল ওরা। গাড়ি করে বিকেলে নিয়ে গেল সবাইকে, বৈকুন্ঠও গেল ওর ছেলেমেয়েদের নিয়ে। প্রণব উঠল স্টেজে, এখানে ওকে কেউ চেনে না, ভেবেছিল কেউ পাত্তা দেবে না, কিন্তু যেই প্রণব, “না মন লাগে না” বাজাতে শুরু করল বেহালায়, শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ। এরপর বাজালো প্রণব, “কেয়া এহি প্যার হ্যায়,” “দিওয়ানা হুয়া বাদল”, “ফুলোকে রংসে”, “আমার মাধবীলতা কী আবেশে দোলে।” পাঁচটা গান বাজাবে ঠিক করে এসেছিল আধঘন্টায় কিন্তু শ্রোতাদের একান্ত অনুরোধে আরো পাঁচটা গান বাজালো। পর্ণা গাইলো “নিঙ্গারিয়া নীল শাড়ি”, “ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক”, “এমন একটি ঝিনুক খুঁজে”, “তুমি পাথর চোখে দাও যে দৃষ্টি” ইত্যাদি গানগুলো, সবাই মুগ্ধ। স্টেজে প্রিন্সিপাল এসে অকুন্ঠ প্রশংসা করে হাতে দিল দশ হাজার টাকার চেক, শাল, মিষ্টির প্যাকেট, ফুলের স্তবক আর সেই ছাত্রদের ডেকে সাধুবাদ দিলেন এমন গুণী শিল্পীদের নিয়ে আসার জন্য। বেড়াতে এসে সঙ্গীতের দৌলতে এমন অভাবনীয় প্রাপ্তিতে ওরাও আনন্দিত।

॥আলিঙ্গন॥

যখন এসেছিলে অহনা আর পরাগ বন্ধুদের সঙ্গে তখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছে। দূরে মেঘে ঢাকা আকাশেরপ্রেক্ষাপটে শুভ্র ভিক্টোরিয়ার সবুজের গালিচার মাঝে ওদের দুটো অবুঝ মনের প্রথম দেখা, অহনা আর পরাগ। পরাগের চোখের দিকে তাকিয়েই মনে হয়েছিল বিরহী যক্ষ বসে যেন কোন সুদূরের প্রিয়ার প্রতীক্ষায়। আচমকা বাজ পড়ার শব্দ আর বিদ্যুতের ঝলকানি এসে দূরত্ব আর সংকোচ সরিয়ে দিল ওদের। হঠাৎ আবিষ্কার করল অহনা ও ছুটে এসে আশ্রয় নিয়েছে পরাগের পেছনে। পরাগ বলল, ভয় নেই, স্মৃতিসৌধের মাথায় ঐ পরীটা কিন্তু বজ্রনিরোধক। সেদিন প্রথম ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে পরীটাকে দেখলো অহনা। হাতের ক্লারিওনেটটা নাকি বাঁশি ওটা যেন অহনার অভিসারের খবর সবদিকে রাষ্ট্র করে দেবে বলে চেয়ে আছে ওদের দিকে। চকিতে নিজেকে আর দৃষ্টি সরিয়ে নিল অহনা।

দামী কলেজের কৃতি ছাত্র পরাগের সাথে আলাপ অহনার এক আর্ট এক্সিবিশনে গিয়ে। যেহেতু একই দিকের বাসিন্দা তাই দেখা হত কারণ “অহনা তখন আঠারো, অহনা তখন শাড়ি”, কলেজের সেকেন্ড ইয়ার। অহনার লম্বা ঘন চুলে আর দীঘল আয়ত চোখে পরাগ যেন নিজের ঠিকানা খুঁজে পেল। অহনা পেল যেন এক ভরসার জায়গা ওর ঘিরে থাকা ভালোবাসায়, প্রেমে। ওরই অনুরোধে এক বর্ষণমুখর দিনে আগমন হল ওদের ভিক্টোরিয়ায়, প্রথম অহনা মাকে মিথ্যে বলে দেখা করল একা একা ভিক্টোরিয়ায়। পরাগের প্রথম চুম্বনের সাক্ষী কিন্তু ভিক্টোরিয়ার ওই পরী। সেটাও সেইদিনই ওই বর্ষণসিক্ত বিকেলে ঠিক বেরিয়ে যাবার আগে। মনে পড়ে অহনার সেদিন সারারাত ঘুমোতে পারেনি ওই অভিজ্ঞতাকে মনে করে। তারপরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে।

BANGLADARSHAN.COM

পরাগের আর অহনার চাকরি হয়েছে, বিয়ে হয়েছে, ছেলেমেয়েরা এসেছে, তাদের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত থেকেছে ওরা, কেটে গেছে আরো পঁচিশটা বছর। আজকে আবার এমনই এক বর্ষার মেঘমেদুর দিনে পরাগ ওকে আবার আসতে বলেছে ভিক্টোরিয়ায়। “আসব না আসব না” করেও শেষ পর্যন্ত বাহান্নর অহনা এসেছে, পারেনি উপেক্ষা করতে পরাগের আহ্বান। এসে গেটের থেকে ঢুকে এসে দেখে পরাগ আগেই এসে বসে আছে হাতে গোলাপ, সেই দুচোখ ভরা আকুতি আর প্রেম নিয়ে। অহনা এগিয়ে গিয়ে ওর পাশে বসতেই বলল, “আজকের চুমুটায় আর পরীকে সাক্ষী রাখবো না, ওটা বাড়ি গিয়ে হবে। আজকে পরী সাক্ষী থাকুক আমাদের সাতাশ বছরের প্রেম আর পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনের নিবিড় আলিঙ্গনের, “বলে অহনাকে কিচ্ছু বলার সুযোগ না দিয়ে জড়িয়ে ধরল উষ্ণ আলিঙ্গনে আর অহনা অনুভব করল পরী তাকিয়ে হাসছে দেখে এতোদিনেও প্রেম অম্লান রয়েছে। অহনাও জড়িয়ে ধরল প্রেমিকস্বামী পরাগকে পরম নির্ভরতায়। সম্পর্ক পুরোনো হলেও প্রেম যে চিরনবীন ওদের মনে।

॥আলো দেওয়া॥

গতবছরে আমফানের ঝড় শুরু হতেই আলো গেল সোহিনীদের বাড়িতে। বাড়িতে সোহিনী, মেয়ে কুহু, বর অর্পিত, দেওর সুজিত, শাশুড়ি অর্চনাদেবী আর নিচে ভাড়াটের পরিবারের পাঁচ জন। পাওয়ার নেই মানে পাম্প চলবে না, জল নেই। সোহিনীরা রান্না করল না, কারণ রান্না করলে বাসন হবে, সেসব ধুতে জল লাগবে, তাই চিঁড়ে-মুড়কি খেয়ে রইল তারা টানা চারদিন। স্নান হলো না, জামাকাপড় ধোয়া গেল না জলের অভাবে। ইলেকট্রিক সাপ্লাইতে ফোন করতে ফোন ধরল না ওরা। ইলেকট্রিকের অফিসে গেল অর্পিত, তাদের অফিসের ঝাঁপ ফেলা। তিনদিনের পরে সবার পাওয়ার এলো, সোহিনীদের এলোনা কারণ সবার ওভারহেড লাইন আর ওদেরটাই একমাত্র আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন। সোহিনীর ক'দিনে বাঁচার ইচ্ছে চলে গেছে। দুর্বিসহ অবস্থা হলো এই কদিনে, সোহিনীর ইচ্ছে করছিলো পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে, কেমন অস্থির অস্থির লাগছে তার। আলো নেই, জল নেই, চরম অবস্থা তাদের চলল।

পেছনে প্রতিবেশী ব্রতীনরা থাকে, মা বাবা আর ব্রতীন। ব্রতীনের বৌ পপির সাথে সোহিনীর খুব হৃদ্যতা ছিল।-বাপের অত্যাচারে পপি বহুকাল বাপের বাড়িতে গিয়ে রয়েছে-ব্রতীনের মা, দুই বুড়ো বুড়ি টিকতে দেয় নি মেয়েটাকে। একসময় ব্রতীনের যত পুজোর জোগাড় করে দেওয়া, ভোগ রান্না করে দেওয়া, নিজের পুজোর বাসন, হোমকুন্ড দিয়ে দেওয়া সব সোহিনী করেছে, কারণ পপি ওকে নিজের দিদি মনে করে আবদার করত আর পপিকে আর ব্রতীনকে অর্পিত, সোহিনী, কুহু যেহেতু খুবই ভালোবাসতো তাই ওরা সেই আবদার রাখতে দুবার ভাবতো না। সোহিনী ভালো কিছু রান্না করলেই হয় ওদের পাঠিয়ে দিত বা ওদের দুজনকে বাড়িতে ডেকে এনে খাওয়াতো, সে ফ্রাইড রাইস, মাংস হোক, পাটিসাপ্টা হোক কী চিংড়ি মালাইকারি আর সেটা ব্রতীনের মা বাবার ভীষণ রাগের জায়গা ছিল। ব্রতীন আর পপি দুজনেই সোহিনীর রান্নার বিরাট ভক্ত।পপির সুখদুঃখের সব কথা পপি সোহিনীর কাছে বলতো এসে। আজকে আট বছর পপি চলে গেছে ওর বাপের বাড়ি, ওখানে থেকেই চাকরি করে, বেড়াতে যায়, মাঝে মাঝে পুজোর জামাকাপড়, পয়লা বৈশাখের উপহার দিতে আসে কিন্তু সোহিনীর সঙ্গে আর কথা হয় না। পপি যাওয়ার পরে ব্রতীনের সঙ্গে কথাবার্তা আছে মাত্র।

আম্ফানের চারদিনের পরে হঠাৎ ব্রতীন এলো সোহিনীদের বাড়িতে, অর্পিতকে নিয়ে ইলেক্ট্রিসিয়ান রাসুকে দিয়ে নিজেদের বাড়ি থেকে টেম্পোরারি কানেকশনে ওদের কানেকশন চালু করল। শুধু পাম্প চললে ফ্রিজ চলবে না বলে গেল ব্রতীন আর ইলেক্ট্রিসিয়ান বাসু, তবু তো মাথার ওপরে পাখাটা ঘুরলো, ঘরে আলো জ্বলল, ফ্রিজটাও চলল বলে আবার রান্না করে রাখা গেল ফ্রিজে। যেদিন ব্রতীন এসে টেম্পোরারি কানেকশনে ওদের পাম্প আর আলো পাখা চালালো, সোহিনী ব্রতীনকে বলল, “তুই দুর্দিনে বড়ো উপকার করলি ভাই, যেন আলো হয়ে এলি তুই আমাদের বাড়িতে, আলোর রাস্তা, জীবনে ফেরার রাস্তা দেখালি, তোকে একদিন আসতে হবে কিন্তু খেতে।” ব্রতীন বলল, “তোমরা কী আমাকে কখনো পর ভেবেছো? অন্ততঃ এটুকু করতে দাও, তোমার হাতের ভালো ভালো রান্নার আমি আজও ভক্ত, যেদিন বলবে হাজির হয়ে যাব।” অর্পিত জড়িয়ে ধরল ব্রতীনকে নিজের বুকে।

একমাস পরে ইলেকট্রিক সাপ্লাই ওদের লাইন ঠিক করল, তখন ওভারহেড করে দিয়ে গেল ওদের পাওয়ার সাপ্লাই। ব্রতীন আর পপিকে তারপর nemontগতবছরে আমফানের ঝড় শুরু হতেই আলো গেল সোহিনীদের বাড়িতে। বাড়িতে সোহিনী, মেয়ে কুহু, বর অর্পিত, দেওর সুজিত, শাশুড়ি অর্চনাদেবী আর নিচে ভাড়াটের পরিবারের পাঁচ জন। পাওয়ার নেই মানে পাম্প চলবে না, জল নেই। সোহিনীরা রান্না করল না, কারণ রান্না করলে বাসন হবে, সেসব ধুতে জল লাগবে, তাই চিঁড়ে-মুড়কি খেয়ে রইল তারা টানা চারদিন। স্নান হলো না, জামাকাপড় ধোয়া গেল না জলের অভাবে। ইলেকট্রিক সাপ্লাইতে ফোন করতে ফোন ধরল না ওরা। ইলেকট্রিকের অফিসে গেল অর্পিত, তাদের অফিসের ঝাঁপ ফেলা। তিনদিনের পরে সবার পাওয়ার এলো, সোহিনীদের এলোনা কারণ সবার ওভারহেড লাইন আর ওদেরটাই একমাত্র আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন। সোহিনীর ক'দিনে বাঁচার ইচ্ছে চলে গেছে। দুর্বিসহ অবস্থা হলো এই কদিনে, সোহিনীর ইচ্ছে করছিলো পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে, কেমন অস্থির অস্থির লাগছে তার। আলো নেই, জল নেই, চরম অবস্থা তাদের চলল।

পেছনে প্রতিবেশী ব্রতীনরা থাকে, মা বাবা আর ব্রতীন। ব্রতীনের বৌ পপির সাথে সোহিনীর খুব হৃদ্যতা ছিল।-বাপের অত্যাচারে পপি বহুকাল বাপের বাড়িতে গিয়ে রয়েছে-ব্রতীনের মা, দুই বুড়ো বুড়ি টিকতে দেয় নি মেয়েটাকে । একসময় ব্রতীনের যত পুজোর জোগাড় করে দেওয়া, ভোগ রান্না করে দেওয়া, নিজের পুজোর বাসন, হোমকুন্ড দিয়ে দেওয়া সব সোহিনী করেছে, কারণ পপি ওকে নিজের দিদি মনে করে আবদার করত আর পপিকে আর ব্রতীনকে অর্পিত, সোহিনী, কুহু যেহেতু খুবই ভালোবাসতো তাই ওরা সেই আবদার রাখতে দুবার ভাবতো না । সোহিনী ভালো কিছু রান্না করলেই হয় ওদের পাঠিয়ে দিত বা ওদের দুজনকে বাড়িতে ডেকে এনে খাওয়াতো, সে ফ্রাইড রাইস, মাংস হোক, পাটিসাপ্টা হোক কী চিংড়ি মালাইকারি আর সেটা ব্রতীনের মা বাবার ভীষণ রাগের জায়গা ছিল । ব্রতীন আর পপি দুজনেই সোহিনীর রান্নার বিরাট ভক্ত।পপির সুখদুঃখের সব কথা পপি সোহিনীর কাছে বলতো এসে। আজকে আট বছর পপি চলে গেছে ওর বাপের বাড়ি, ওখানে থেকেই চাকরি করে, বেড়াতে যায়, মাঝে মাঝে পুজোর জামাকাপড়, পয়লা বৈশাখের উপহার দিতে আসে কিন্তু সোহিনীর সঙ্গে আর কথা হয় না। পপি যাওয়ার পরে ব্রতীনের সঙ্গে কথাবার্তা আছে মাত্র।

আম্ফানের চারদিনের পরে হঠাৎ ব্রতীন এলো সোহিনীদের বাড়িতে, অর্পিতকে নিয়ে ইলেক্ট্রিসিয়ান রাসুকে দিয়ে নিজেদের বাড়ি থেকে টেম্পোরারি কানেকশনে ওদের কানেকশন চালু করল। শুধু পাম্প চললে ফ্রিজ চলবে না বলে গেল ব্রতীন আর ইলেক্ট্রিসিয়ান বাসু, তবু তো মাথার ওপরে পাখাটা ঘুরলো, ঘরে আলো জ্বলল, ফ্রিজটাও চলল বলে আবার রান্না করে রাখা গেল ফ্রিজে। যেদিন ব্রতীন এসে টেম্পোরারি কানেকশনে ওদের পাম্প আর আলো পাখা চালালো, সোহিনী ব্রতীনকে বলল, “তুই দুর্দিনে বড়ো উপকার করলি ভাই, যেন আলো হয়ে এলি তুই আমাদের বাড়িতে, আলোর রাস্তা, জীবনে ফেরার রাস্তা দেখালি, তোকে একদিন আসতে হবে কিন্তু খেতে।” ব্রতীন বলল, “তোমরা কী আমাকে কখনো পর ভেবেছো? অন্ততঃ এটুকু করতে দাও, তোমার হাতের ভালো ভালো রান্নার আমি আজও ভক্ত, যেদিন বলবে হাজির হয়ে যাব।” অর্পিত জড়িয়ে ধরল ব্রতীনকে নিজের বুকে।

একমাস পরে ইলেকট্রিক সাপ্লাই ওদের লাইন ঠিক করল, তখন ওভারহেড করে দিয়ে গেল ওদের পাওয়ার

সাপ্লাই। তারপরে পরেই ব্রতীন আর পপিকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালো অর্পিত আর সোহিনী। চারজনেই স্বীকার করল ওরা নিজেদের মধ্যে কথায় কথায় যে আটবছর পরেও ওদের অন্তরের টান অকৃত্রিম আছে আজও আগের মতোই।

BANGLADARSHAN.COM

॥আধ জানন্তী॥

পাশাপাশি বাড়িতে থাকে দত্তবাবু আর ব্যানার্জীবাবু। দত্তবাবুর দুই মেয়ে, কনভেন্টে পড়ে, বৌ টেনেটুনে ম্যাট্রিক পাশ হলে কী হবে তার চালের চোটে গগন ফাটে। মেয়েরা কনভেন্টে পড়ে বলে মনে তার অহংকারের শেষ নেই। মেয়েদের যখন গুড় দিয়ে রুটি দেয় জলখাবারে, তাদেরকে পেছনের বাগানে বসে খেতে বলেন আর যখন লুচি তরকারি মিষ্টি দেন জলখাবার, তখন একেবারে রাস্তার ওপরের স্ল্যাবে দাঁড়িয়ে তারা খায়। ভীষণ অশিক্ষিত পরিবার দত্তবাবুর। কথায় কথায় ব্যানার্জীগিন্নি প্রমিতাকে শুনিয়ে দেন দত্তগিন্নি গায়ত্রী যে কনভেন্টে পড়াতে গেলে পয়সার জোর চাই।প্রমিতার দুই ছেলে, এক মেয়ে, মেয়ে সবার ছোট আর খুবই আদরের।প্রমিতার ছেলে মেয়েরা সবাই পড়াশোনায় বেশ ভালো, কিন্তু তাদের আস্ফালন আর দেখনদারী নেই।

গায়ত্রীর ছেলে ছেলে করে ছোটমেয়ের পনেরো বছরে আবার মেয়ে হলো পাপাই। গায়ত্রীর আগের দুই কন্যাই বেশ শ্যামলা গায়ের রঙ, সেই তুলনায় পাপাই একটু পরিষ্কার।গায়ত্রী সেটা নিয়ে একদিন প্রমিতাকে শোনাতে গেলে শান্ত প্রমিতা বলে দেন, “ফর্সা কোথায়, আর সবাই কালোর মধ্যে ও একটু আবছা।” আসলে প্রমিতার পরিবারে সবাই বেশ ফর্সা। গায়ত্রীর ভীষণ গায়ে লাগে কথাটা, পরেরদিন প্রমিতা বালিশ রোদে দিচ্ছেন তার লম্বা চুল খুলে, গায়ত্রীর ছোট মেয়ে ষোলোর চুমকি হঠাৎ বলে ওঠে, বড়োলোকের বিটি লো, লম্বা লম্বা চুল, আবার বালিশ রোদে দেয়। প্রমিতা হকচকিয়ে যায় প্রথমে, শেষে বলে, “যেমন মা তেমনি বিটি, ঝগড়াটি, ঝগড়াটি।” এই নিয়ে অশান্তি বাড়ে আর দুই পরিবারের কথা বন্ধ হয়ে যায়।

কয়েক বছর পরে, প্রমিতার বাড়িতে খুব ভীড় আজকে, প্রমিতার বড়ো ছেলে দীপ্তেন জেলায় মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছে, দীপ্তেনের স্কুলের থেকে, স্থানীয় কাগজ থেকে, বোর্ড থেকে বহু শিক্ষক, সাংবাদিকের সমাগম আজকে ওদের বাড়িতে। দীপ্তেনকে নিয়ে স্বভাবতই ভীষণ গর্বিত প্রমিতা, কিন্তু তাদের প্রকাশ মার্জিত। কয়েক বছর পরে গায়ত্রীর দুই মেয়ে বাবলি আর চুমকি একে একে আই সি এস ই পাশ করে একদম টেনেটুনে, কোনোরকমে আই এস সি, তারপর কলেজে ঢুকে তারা টের পেল শুধু কনভেন্টে পড়া নয়, বিষয়কে না ভালোবেসে পড়লে সবই ভাসা ভাসা জানা হয়, সেখানে ওই “আধ জানন্তী প্রাণে মারা” অবস্থাই হয়, সব অর্ধেক জেনে শেষে নিজের প্রাণ যাবার জোগাড় আর কী।

আস্তে আস্তে সময়ে দীপ্তেন, তার ভাই সৌরেন দুজনেই ইঞ্জিনিয়ার হল, দীপ্তেন খড়্গপুর আই আই টি থেকে পাশ করে আমেরিকায় ইলেক্ট্রনিকসের কোম্পানিতে উচ্চ পদে আসীন আর সৌরেন মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে মুম্বাইতে চাকরি করছে। প্রমিতার মেয়ে দীপাবলিও ফার্স্ট ডিভিশনে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে, গ্রাজুয়েট হয়, ভালো বিয়েও হয় তার হায়দরাবাদে, জামাই আই টি তে আছে। বাবলির বিয়ে হয়েছে আসানসোলের কাছে দিশেরগড়ে আর চুমকির বিয়ে হয়েছে মধুপুরে। ছেলে পাপাই ঠিকমতো মানুষ হয়নি, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক তৈরী হয়েছে, মা বাবাকে দেখে না। দত্তবাবু আর গায়ত্রী একটা একতলা বাড়িতে ভাড়া নিয়ে থাকেন, মেয়েরাও তেমন যোগাযোগ রাখে না তাদের সাথে। ছেলে পাপাই অন্যত্র থাকে বৌ বাচ্ছা নিয়ে।

গায়ত্রী এখন অনুভব করেন তিনি সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারেন নি ছেলে মেয়েদের।

এরপরে সেই পাপাইয়ের সঙ্গে দীপ্তেনের দেখা হয় আটলান্টায়, পাপাই, যার বিয়ে হয়েছে অনাবাসী আমেরিকায় চাকরি করা একটি ছেলের সঙ্গে, এসে নিজের থেকে নিঃশর্তে ক্ষমা চেয়ে দীপ্তেনকে প্রণাম করে প্রমিতার সামনে। দীপ্তেন মা প্রমিতাকে সেদিন বলে, “এটাই ভালো হলো, সময় তার জবাব দিয়ে গেল।” প্রমিতা হাসেন তৃপ্তির হাসি।

BANGLADARSHAN.COM

॥সুই লেনা॥

উফফফফ...টানা এতটা রাস্তা বাসে করে আসা চাট্টিখানি কথা, তায় আবার এই দেহাতিদের সাথে। কিন্তু আজকাল বাঙালিদের তেমন ধর্ম করার দিকে মন নেই, তাই স্বামী নৃপতিকে নিয়ে নিরুপমা দেবীকে আসতেই হয়েছে এইবারে গঙ্গাসাগর মেলায় সংক্রান্তির স্নান করতে। নিরুপমা দেবী থাকেন সেই সুদূর সুরাটে, তাপ্তি নদীর তীরে আরব সাগরের কাছে। মাঝে মাঝেই সেখানে নানা পুজো পার্বণ লেগেই আছে। নৃপতি সুরাটের এন টি পি সির কর্মী। সেখানকার কোয়াটারে থাকেন, এক ছেলে মৃণাল, সে চাকরি নিয়ে থাকে হায়দ্রাবাদে আর মেয়ে মধুশ্রীর বিয়ে হয়েছে ব্যাঙ্গালোরে, সে সেখানেই থাকে,ছেলের বৌ দেবপর্ণাও চাকরি করে হায়দ্রাবাদেই। ফলে ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব শেষে তাঁরা সেই দুজন আর দুজনেরই ঘুরে বেড়ানোর আর তীর্থ করার নেশা। তাই এবারে যখন শুনলেন যে বাস যাচ্ছে গঙ্গাসাগরে তাঁরাও সেই সুযোগটা নিলেন। কথায় বলে, “সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার।” সেই একবারটা এবারেই পূরণ করার ইচ্ছে দুজনের।

কিন্তু বাসে উঠে দেখলেন দুচারটে পরিচিত মুখ থাকলেও সব সেই অবাঙালি, অবশ্য তাতে নিরুপমাদেবীর আপত্তি নেই, এঁদের মাঝেই তো কেটে গেল তাঁর জীবন। কিন্তু সহযাত্রীদের সঙ্গে মানসিকতায় বিস্তর ফারাক তাঁদের। এরা একাদশী, অমাবস্যা,পূর্ণিমা, সংক্রান্তি মেনে চলে ওদের প্রচলিত পঞ্জিকা বিক্রম সম্বৎ অনুযায়ী আর নিরুপমা মানেন বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা, ফলে বার, তিথি, উপবাসের তারতম্য হয়েই যায়। কিন্ত যেহেতু একছাদের তলায় বাস নয়, তাই তেমন অসুবিধে হয় না। কিন্তু এই একসপ্তাহ তো এদের সঙ্গেই থাকতে হবে। তাছাড়া এদের রুটি আর আচার হলেই খাওয়া হয়ে যায়, নিরুপমার তো তেমন নয়। যদিও অনেক রকমের শুকনো খাবার সঙ্গে এনেছেন কিন্তু একযাত্রায় পৃথক ফল করতে নিজেরও চক্ষুলজ্জায় বাধে।

সঙ্গে যারা আছেন যেমন অরুণ সিং আর তার স্ত্রী রুক্মিণী, বাদল গর্গ আর তার স্ত্রী দিব্যা, মহেশ কালে আর তার স্ত্রী শিবানী, হরিভাই চোখানি আর তার স্ত্রী বিজলি, দেবেন্দ্র আর তার স্ত্রী অনুরাধা এরা সব তাঁর প্রতিবেশী। কেউই মানুষ খারাপ নয়। তিনরাত্রি বাসে চলে তারা পৌঁছলেন নামখানা। এখানে এসে তাঁরা জানতে পারলেন যে প্রত্যেককে টিকা নিতে হবে স্মলপক্স, জন্ডিস আর কলেরার কারণ গঙ্গাসাগরে জল থেকে ব্যাপক সংক্রমণ হয়, তাই সরকার থেকে ব্যবস্থা করেছে এই টিকাকরণের।টিকা ছাড়া বাসে কেউ থাকলে বাসকে ভেসেলে তুলবে না।নৃপতি গিয়ে খোঁজ নিয়ে এলেন কোথায় টিকা দিচ্ছে, নিরুকে নিয়ে যাবেন বলে এলেন বাসের কাছে।নিরুপমা দেখলেন বাসে বেশ একটা শোরগোল পড়ে গেছে।

নৃপতি নিরুপমাকে নিতে এসে দেখলেন বিশালদেহী অরুণ সিং, হরিভাই চোখানি আর দেবেন্দ্র নিরুপমাকে বোঝাচ্ছেন যাতে সবাই মিলে বিরোধীতা করে সবাইয়ের টিকা না নেওয়াটা অনুমোদন পায়, মানে টিকাকরণ ভন্ডুল করা যায়। নিরুপমা শিক্ষিত মহিলা, তিনিও পাল্টা যুক্তি দিচ্ছেন টিকা নেওয়ার স্বপক্ষে। ওদের যুক্তি হচ্ছে টিকা নিতে গেলে দেরী হয়ে যাবে, তাতে তাদের সংক্রান্তির পুণ্যস্নানটা হবে না আর নিরুপমার যুক্তি হচ্ছে টিকা নিতে আর কতক্ষন লাগবে, আধঘন্টায় হয়ে যাবে সকলের আর নেওয়া থাকলে অসুখের সংক্রমনটা এড়ানো যাবে, কিন্তু কে শোনে এসব সদুপদেশ!!! এই পরিবারগুলো এবং অন্য পরিবারের

অনেকের সঙ্গেই এসেছে তাদের বৃদ্ধা মা বাবা। সবারই দেখা গেল প্রবল আপত্তি টিকা নিতে। এদিকে তীর্থযাত্রা কর্তৃপক্ষ আর বাসের মালিক ঘোষণা করে দিয়েছেন টিকা না হলে তাকে এখানেই নামিয়ে দিয়ে চলে যাবেন তাঁরা। শেষে সেই "ঠেলাঠেলির ঘর, খোদা রক্ষা কর" অবস্থাতে সবাই গিয়ে লাইনে দাঁড়ালো টিকার জন্য। মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়েছেন নিরুপমা আর নৃপতি, ঢোকার আগে দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য, বিশালদেহী অরুণ সিং যিনি প্রথমে দাঁড়িয়ে আছেন, তার স্থূলকায়া স্ত্রী রুক্মিণী আর মা ছিলেন সামনে, যেই ভেতরে ঢোকার ডাক এলো এরা তিনজনেই বুকচাপড়ে কাঁদতে বসে গেল, "হায় রে, মাই রে, মার ডালা রে, বরবাদ হো গেই রে" এমন সময়ে পেছনে দাঁড়ানো অল্পবয়সী ভলান্টিয়ার প্রদীপ, সে জোর করে ঢুকিয়ে দিল তাদের অস্থায়ী ক্যাম্পে। ভেতর থেকে প্রাণবিদারক আর্তনাদ শুনে নৃপতি ঘাবড়ে গেলেন, "কী ব্যাপার রে বাবা!!!" দেখা গেল তিনজনেই কাঁদতে কাঁদতে বেরোচ্ছে আর এমন হবে জানলে কখনোই আসতো না বলতে বলতে বাইরে এলো। খুব সহানুভূতি নিয়ে জিজ্ঞাসা করে হতভম্ব হয়ে গেলেন নৃপতি আর নিরুপমা, সুচ ফুটিয়ে টিকা নিতে হবে বলেই তারা প্রথম থেকে আপত্তি করছিলো কারণ "সুই লেনে সে জান কা খাতড়া বনতা হয় সাহাব, এক সুই ইদার সে ঘুষে তো আপকা হালত খারাব হইবে কে নেহি, বোলো?" বক্তব্য অরুণ আর রুক্মিণীর অথচ পুণ্য করার লোভও আছে "ষোলোআনার ওপরে আঠারো আনা", তাই সুই ঢোকাতেই হাতে ওই প্রাণফাটা চিৎকার করছে এরা। নৃপতি আর নিরুপমা নিজেরা টিকা নিয়ে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষন এই মজার প্রহসনটুকু উপভোগ করলেন, তারপর বাসে গিয়ে উঠলেন হাতে স্ট্যাম্প মারা টিকাকরণের সার্টিফিকেটটা নিয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

॥বৈতরণী পার॥

অর্ণববাবু আর তাঁর স্ত্রী প্রণতিদেবী চলেছেন কুম্ভস্নানে প্রয়াগরাজে। দূর্গাপুরের চাকুরে অর্ণববাবু,আর তাঁর স্ত্রী প্রণতিদেবী দুজনেই মনেপ্রাণে পুণ্যলোভী এবং বাতের ব্যথায় কাবু। এর আগে তাঁরা ঘুরে এসেছেন গঙ্গাসাগর, জয়দেবের মেলা, এবারের টার্গেট প্রয়াগের কুম্ভমেলা, এবারে সেখানে নাকি পূর্ণকুম্ভ, সেখানে স্নান করলে স্বর্গলাভ। কন্ডাকটেড ট্যুরের বাসে একসাথে দেড়শো লোক নিয়ে এক জানুয়ারি মাসের রাত্রে তাঁরা বাসে উঠে বসলেন। দুই মেয়ে অর্ণববাবুর, একজন মাধ্যমিক দেবে আর একজন সবে কেজি। কিন্তু ছোট মেয়ে তার দিদির বড়ো নেওটা, তাতে সুবিধেই হয়েছে অর্ণববাবুদের। ঠিকে কাজের লোক রেবাকে বলে এসেছেন এই দশদিন যেন একটু রাত্রে এসে শোয় ওর বাচ্ছাদের নিয়ে আর একটু রান্নাবান্না করে দেয় মেয়ে দুটোকে। রেবা দেবেও কারণ রেবাও খুব ভালোবাসে মেয়েদের, ছোট থেকে দেখছে বলে।

দুর্গাপুরে জানুয়ারির এই সময়ে ভালোই ঠান্ডা, কিন্তু পশ্চিমী ঠান্ডার কামড় বুঝলেন সবাই এলাহাবাদে নেমে। ত্রিবেণী সঙ্গমে হু হু পৌষমাঘের হাওয়ায় যেন হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে, তাতে আবার তাঁরা দুজনেই ভয়ানক শীতকাতুরে। তাঁরা যেদিন পৌঁছলেন তার দুদিন পরে যোগের শাহীস্নান। স্নানের সময় ভোর চারটে থেকে, শীতে কাঁপতে কাঁপতে সবার সঙ্গে গেলেন দুজনে স্নানে এবং কুম্ভস্নানের পুণ্য অর্জন করে ফিরে এলেন দুর্গাপুরে ঠিক দশদিনের মাথায়।

BANGLADARSHAN.COM

যেদিন ফিরলেন বাস এসে দাঁড়ালো তাঁদের বাড়ির সামনে, দুই মেয়ে, রেবা এসে দাঁড়ালো বাসের গেটের কাছে। কিন্তু তিনজনেই অবাক হয়ে দেখলো যে অর্ণব আর প্রণতি নামছেন কাতরাতে কাতরাতে লেংচে লেংচে। বাসের ভেতর থেকেও অনেকের কাতরানোর আওয়াজ আসছে। ব্যাপার কী? মা বাবাকে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুনলো ওরা যে শাহীস্নানের সময়ে গরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার করায় স্থানীয় পুরোহিত। ওঁদেরকেও সেই গরুর লেজ ধরে পার করাচ্ছিল। এমন সময়ে একসঙ্গে দশবারোজন লোক ত-ার লেজ ধরে টানাটানি করছে দেখে সেই গরু ক্ষেপে গিয়ে চাট মেরেছে পেছনের পায়ে আর তারপরে দৌড়ে পালিয়েছে তাদেরকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে। সেই চাট সোজা এসে লেগেছে সামনে যাঁরা ছিল তাঁদের হাঁটুতে আর পায়ে, সামনের জনের মধ্যে বাতের রুগী অর্ণব আর প্রণতিও ছিলেন আর তারই ফলে জখম হয়েছেন ভালোই, শীতের ব্যথা আর ক্ষত দুটোই টাটিয়ে উঠেছে দুজনের। আর ধাক্কায় পড়ে গিয়েছেন দুজনেই। ওখানে তেমন প্রয়োজনীয় ওষুধ বা ব্যথা কমানোর ওষুধও পাননি ওঁরা। অর্ণববাবুর বড়োমেয়ে মাবাপের শুশ্রূষা করতে করতে বলল-, “তা ব্যথা পেলেও বৈতরণী পার তো হয়ে এসেছো। আর চিন্তা নেই, মরার পরে সোওওওওজা সগগোলাভ তোমাদের কেউ আটকাতে পারবে না, আগের থেকেই ইঁট পেতে ফেলতে পারলে তো!!!” শুনে রেবা খুব হাসতে থাকে আর অর্ণব আর প্রণতির মুখ গোমড়া হয়ে যায়। কিন্তু ব্যথার তাড়সে মুখে কথা সরে না তাঁদের।

॥সাফল্য॥

সেদিন ইন্টারভিউয়ের চিঠিটা পেল পৃথ্বীশ, একটা নামী কোম্পানি, তাঁরা ইন্টারভিউতে ডেকেছে। মনে মনে আবার আরেকটা অসফলতার জন্য প্রস্তুত হলো ও। নির্দিষ্ট দিনে ইন্টারভিউ হলো, এতো বড়ো কোম্পানি, যেখানে পনেরো হাজার প্রার্থী ইন্টারভিউ দিল, নেবে মাত্র পাঁচ জনকে। প্রথম রাউন্ডের রেজাল্ট ওরা কম্পিউটারে দেখে আধঘন্টায় জানিয়ে দেবে বলছে।

পৃথ্বীশ জানে ওর হবে না, কত ভালো অভিজ্ঞ ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দিয়েছে। তাই পরীক্ষা দিয়েই বেরিয়ে আসছিলো, ওই কোম্পানির যারা পরীক্ষা নিচ্ছিলো, বলল আধঘন্টা বসে যেতে।এদিকে এই ছোট্ট প্রাইভেট কোম্পানি যেখানে ও এখন নগণ্য মাইনেতে সারাদিন কাজ করে সেখানে দুঘন্টার ছুটি নিয়ে গেছে। তবু বসেই গেল, দেখলো পনেরো জনকে আলাদা করেছে ওরা কম্পিউটার টেস্টের জন্য, তার মধ্যে প্রথম নামটা ওর। সেদিনই কম্পিউটার টেস্ট হলো।

তারপর একদিন পুরোনো অফিসে ওরা ওকে ফোন করে জানালো পৃথ্বীশ যেন নির্দিষ্ট দিনে গিয়ে বেলা দুটোয় দেখা করে ওদের সঙ্গে। পৃথ্বীশ গেল এবং পৃথ্বীশকে এইচআর কিছু প্রশ্ন করে মেডিকেলের জন্য পরেরদিন যেতে বলল। দুদিন পরে ও জয়েন করল আইবিএমের সফটওয়্যার গ্রুপে বিরাট মাইনেতে অন্য সুযোগসহ্ব এপয়েন্টমেন্ট লেটারটা হাতে পেয়ে ওর মনে হলো এভাবেও হয়বাড়িতে যাবার পথে প্রেমি !!!কা মধুবেলার সঙ্গে দেখা করে বলল, “চাকরিটা আমি পেলাম মধু শুনছো।” দীর্ঘ না পাওয়ার জীবন যুদ্ধে একদম হেরে যাবার শেষ সীমানায় পৌঁছে ওর জীবনে এই জাদুর স্পর্শটা এলো।

॥সেলুকাস॥

সূর্যসংঘ ক্লাবে পুজোর পরে বিজয়া সম্মিলনীতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটক হবে। সেখানে চন্দ্রগুপ্ত হচ্ছে সুশ্রী সুদর্শন মৃণাল, চাণক্য হচ্ছে নিষ্ঠাবান পুরোহিত ঈষৎ খোনা গলার নন্দদুলাল, সেলুকাস হচ্ছে সাহেবদের মত চেহারার অর্পণ, অর্পণেরও একটু মেয়েলি গলা তবে এক্সপ্রেশন দারুণ ওর, কিন্তু আলেকজান্ডার কাকে করা যায় সেই নিয়ে একটু ধন্ধে পড়েছেন পরিচালক সুনির্মল। আসলে পাড়ার মনোতোষকেই ভেবেছিল সে, কিন্তু মনোতোষের বড়ো দোষ সে প্রায়ই পার্ট ভুলে গিয়ে স্টেজে মাখায়। তাই তাকে আলেকজান্ডার করার কথা দুবার ভাবতে বসেছে সুনির্মল, আর মনোতোষ আবার কানে একটু খাটো মানে কম শোনে আর কী !!! ...উফফফফভগবান যত জ্বালা কী সুনির্মলের জন্যই তোলা আছে!!! গতবারের নাটকে মনোতোষ স্টেজে উঠে পাঠ ভুলে গেছিল “শ্রীরাধার মানভঞ্জনে”র, প্রম্পটার উইংয়ের পাশ থেকে বলছে, “মানময়ী রাধে .... নীরদকুন্তলা, লোচনচঞ্চলাএকবার বদন তুলে কথা কও।.....” মনোতোষ বলেছিলো, “মানময়ী রাধে .... নীরদকুন্তলা, লুচি, চিনি,ছোলাএকবার বদন তুলে গুড়ুক খাও।....” ঠিক স্টেজে ওঠার আগে গাঁজার ছিলিমে টান দিচ্ছিল মনোতোষ, “কথা কও” তাই “গুড়ুক খাও” হয়ে গেল আর “শ্রীরাধার মানভঞ্জনে” মধুর রসের বদলে প্রবল হাস্যরসে সমাপ্তি ঘটেছিল। এবারে তাই খুবই চিন্তিত সুনির্মল। অথচ এতো সুন্দর চেহারা, এতো ভালো থ্রোইং ছেলেটার, এমন ছেলে হাতের কাছে আর কেউ নেইও। শেষে মনোতোষের সঙ্গে কথা বলে, বাকিদের সঙ্গে আলোচনা করে ওকেই দিল সুনির্মল আলেকজান্ডারের রোল, শর্ত একটাই, ঝোলাতে পারবে না নাটক।

BANGLADARSHAN.COM

ভালোয় ভালোয় স্টেজ রিহার্সালও হয়ে গেল। এলো বিজয়া সম্মিলনীর সেই সন্ধ্যা, মঞ্চস্থ হলো নাটক। সুন্দর এগোচ্ছিল নাটক, প্রম্পটার মন্টুর প্রম্পটিং ঠিকভাবে শুনে ডায়লগ বলে তরতর করে এগোচ্ছে নাটক। প্রায় শেষের দিকে আছে সেই আলেকজান্ডারের বিখ্যাত ডায়লগ, “সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ”, স্টেজে মনোতোষরূপী আলেকজান্ডার আর সেলুকাসরূপী অর্পণ। ঠিক তার আগেই হঠাৎ পাওয়ার গেল, জেনারেটার স্টার্ট দিয়ে আবার শুরু হয়েছে নাটক কিন্তু জেনারেটারের আওয়াজে কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না। মনোতোষরূপী আলেকজান্ডারকে মন্টু প্রম্পট করল “সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ”, মনোতোষ শুনতে পেল না, সে বলছে তখন, “সেলুকাস, ও সেলুকাস, তুমি বলো, তুমি বলো, তুমি বলো হা (তারপরে ওপরে হাত তুলে)... ....হা হা হাতুমি বলো সেলুকাস, যা মনে হচ্ছে বলো হা হা হা হা...“আর সেলুকাসরূপী অর্পণ পুরো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে”, “এঁটা তোঁ ছিল না” বলে উঠতেই দর্শক আসনেও হা হা হা হা, হি হি হি হি চলছে। ড্রপসিন ফেলে দিয়ে সুনির্মল মনোতোষের কাছে পৌঁছনোর আগে মনোতোষ ধাঁ....হাওয়া আর সেলুকাস অর্পণ মুহ্যমান হয়ে বিমূঢ়। সুনির্মল রাগে দাঁত কিড়মিড় করছে।

॥অণু সন্ধান॥

পাঁচবোনের ছোটজন নেহা। বাঁকুড়ার মেয়ে, এমএ পাশ,দিদিদের বিয়ের পরে তার নাম উঠলো বিয়ের খাতায় তখন তার তিরিশ, সে ধরে নিয়েছিল তার বিয়ে হবে না।

বাবা বাঁকুড়া কোর্টের পাবলিক প্রসেকিউটর, জমিদার বংশ, মাও জমিদার বাড়ির মেয়ে, তাই অঢেল পয়সা। কিন্তু মনটা সংকীর্ণ, লোকের মেরেই ওরা জমিদার, লোক খাটানোটা বংশানুক্রমিক ওদের, সেটা জিনবাহিত হয়ে এসেছে নেহার মধ্যে আর সবার ছোট নেহা, বহুদিন বাবার বাড়িতে রাজত্ব করেছে, তার স্বভাবই খবরদারি করা, কাজকর্মে একেবারে অষ্টরম্ভা সে। নেহার বিয়ে হল মেরিন ইঞ্জিনিয়ারের ছোটছেলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার রাজুর সঙ্গে কলকাতায়। রাজুর বিবাহিত আরো দুই ভাই আছে, বড়োজন অন্যত্র থাকে, মেজজন থাকে বাড়িতে বৌ রত্নাকে নিয়ে, সেই রত্না বড়ো চাকরি করে, কিন্তু তার বাবা মধ্যবিত্ত। রত্নাকে নেহা পছন্দ করে না।

বিয়ের পরে নেহার মা-বাবা এসেছে কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে, নেহার কাছেই উঠেছে। তাদের জন্য রত্না শাশুড়ির সঙ্গে রান্না করেছে, তারা এলো, খেল, এবারে বাড়ির লোকেরা খেতে বসেছে। নেহা রোগা, বেঁটে, কালো কাঠিসার চেহারার, রত্না লম্বা, ফর্সা, ভালো চেহারা তার। শাশুড়ির সঙ্গে বসে খাবার সাজিয়ে রত্না খেতে বসলো, পেছনে দাঁড়িয়ে আছে নেহার মা।

রত্না খাচ্ছে, গল্পের ফাঁকে তিনি রত্নার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, “খাচ্ছ খাও, কিন্তু তোমার পেটে কিন্তু এখনই চর্বি জমে গেছে।” রত্নার হাতটা থেমে গেল খেতে খেতে, প্রথমবার উনি এসেছেন এবাড়িতে এ কেমন ভদ্রতা? কেমন কথাবার্তা? রত্না আর খেতে পারলো না, চোখের জল চেপে উঠে পড়ল।

একঘন্টা যায়নি, ওর শুরু হল বমি আর পেটের গন্ডগোল। টানা তিনদিন চলল এমন, ভয়ে রত্না নেহার মায়ের সামনে যায় না, রান্না করে, শাশুড়ি আর নেহা খেতে দেয়।

তৃতীয় দিনে রত্নার মা ওর শরীর খারাপ খবর পেয়ে এসেছে, শুনে বললেন, “নেহার মায়ের নজর লেগে গেছে তোর।” এমন সময় রত্নার শাশুড়ি এসে বললেন, “দিদি, রত্না কদিন গিয়ে থাক আপনার কাছে, নেহার মায়ের নজর একদম ভালো না, সেদিন থেকে ওর শুরু হয়েছে পেটের গন্ডগোল। ওঁর স্বভাব কারুর ভালো দেখলে নজর দেওয়া, এক একজন এমন থাকে।” রত্না আর ওর মা সমর্থন করল।

॥রক্ষক॥

সুতপার বিয়ের পরে যখন শ্বশুরবাড়িতে এলো ওকে তিনতলার দক্ষিণের একফালি রান্নাঘরটাকে বারান্দাসমেত ঝেড়ে সেখানেই বিয়ের খাট, বিছানা পেতে দিয়ে শাশুড়ি বললেন ওখানটাই আজ থেকে ওদের থাকার জায়গা। বর শ্যামল চাকরি করলেও, বাজনা বাজানো ধ্যানজ্ঞান-, তার অবসর মানে হয় বেহালা বাজাচ্ছে নয় পিয়ানো বাজাচ্ছে, সে একেবারেই বৈষয়িক নয়। সুতপারও ভালোই গানের চর্চা আছে, তাছাড়া ও লেখাপড়া ভালোবাসে, ওর অবসরে সর্বক্ষণ হাতে বই। এখানটা আগে রান্নাঘর ছিল বলে মেঝেটা ফাটা, ঘরগুলোর দুদিকে দুটো গাছ, উত্তরে বেলগাছ আর দক্ষিণে আমগাছ আর বিরাট বাগান, মাথাচাড়া দিয়ে তারা ছাদটা ঢেকে ফেলেছে ডালপালায়।

প্রথমে রাগ হত সুতপার ঘরে আলো ঢোকে না বলে, ভেবেওছে গাছগুলো কেটে দেবে। কিন্তু গাছগুলোর জন্য ওদের ঘরে আলো কম হলেও ঘরগুলো ঠান্ডা থাকে গরমকালে। তাছাড়া ওই গাছগুলোতে বহু পাখির বাসা, কাক, চড়াই, টুনটুনি তো আছেই, শালিক, ছাতারে, মাছরাঙা, বুলবুলি, কাঠঠোকরা, হাঁড়িচাচাদের আনাগোনা, গোটা কুড়ি কাঠবেড়ালিরও বাসা ওখানে, পেছনে একটা পুকুর থাকার দরুন বক, সারসও আসে। পাশের নারকোলগাছে বাসা একটা চিল পরিবারের, তারা এসে বিশ্রাম নেয় আমগাছের ডালে, বাগান থেকে ধেড়ে ইঁদুর ধরে খায়।

BANGLADARSHAN.COM

উৎপাত হয় যখন গাছগুলোতে ফল ধরে, আমগাছটা ভালো জাতের ভাগলপুরী ল্যাংড়ার গাছ।আমগাছে ফল ধরলেই পাহারা দিতে হয়, বেলগাছের তাই। পাড়ার ছেলেরা তো বটেই প্রায়ই কয়েকজন বৃদ্ধাকে দেখে সুতপা গাছের তলায় আঁতিপাতি করে ফলের খোঁজে ঘুরতে। কয়েকবছরের মধ্যেও ওর বেশ সখ্যতা হয়ে গেল গাছগুলোর সাথে। এখন কেউ গাছের ডাল কাটলে আগে সুতপা গিয়ে বাধা দেয়। কাক, কাঠবেড়ালিগুলোকে নিয়ম করে খেতে দেয়, ওরাও নির্ভয়ে ঘরে ঢোকে, কাঠবেড়ালি বাচ্ছা পাড়ে।

গতবছরে আমগাছটা আমের ফলনে ছেয়ে গেছিল। সারাদিন শ্যামল, সুতপাকে নজর দিয়ে বসে থাকতে হত ফলচুরির ভয়ে। এমন সময় এলো ঘূর্ণিঝড় আমফান। একদিনের ঝড়ে গোটা এলাকা লন্ডভন্ড হয়ে সামনের বাড়ির তিনতলার ওপরের শক্ত আসবেস্টসের ছাদ উড়ে এসে ভেঙে চার টুকরো হয়ে পড়ল সুতপার ছাদের ওপরে। বেলগাছটার প্রচুর ডালপালা ভাঙলো আর আমগাছের ফল তো ওই ঝড়ের মধ্যে বৃষ্টি মাথায় করে লোকে বস্তা বস্তা কুড়িয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু তিনতলার ওপরে ওদের ঘরগুলো বেঁচে গেল শুধু ওই গাছদুটোর জন্য, ওরা যেন ওদের রক্ষক হয়ে রক্ষা করে গেল ওদের অংশটা। কৃতজ্ঞতায়, আবেগে ঝড় থামার পরে ঝড়ের ধ্বংসলীলা দেখে সুতপা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল গাছদুটোকেই। কোনো প্রত্যাশা না রেখে নিজেদের সহজাত ধর্মে ওরা রক্ষা করে প্রাণে বাঁচিয়ে দিল সুতপার ঘর, প্রাণ আর প্রিয়জনদের।

॥অন্তরায়॥

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জলসায় গিয়ে আলাপ কলেজের লেকচারার সুদীপার আর ইনকাম ট্যাক্সের গেজেটেড অফিসার অয়নের। আলাপ প্রণয়ের হয়ে পরিণয়ে রূপ পেল, সুদীপা অবাক হয়ে দেখলো ওর বাবামা আর-শ্বশুর শাশুড়ির অয়নকে নিয়ে সেই “কী পেনু রে” অবস্থাটা। হীরের টুকরো ছেলে অয়নকে বানের জলে ভেসে আসা সুদীপা নেহাতই কপালজোরে পেয়েছে এমনি মনোভাব দুবাড়িতেই। দুবছরের মাথায় মেয়ে রীতি হতে উদার শ্বশুর শাশুড়ির আর অয়নের প্রগতিশীল মুখোশটা খুলে পড়ল। ওরা কেউই মেয়ে বলে রীতিকে সহ্য করতে পারেনা। সুদীপার বাবাম-োয়েরও মনোভাব “ইস! যদি ছেলে হত!” রীতির একবছরে সুদীপা বেরিয়ে এলো অয়নের সংসার ছেড়ে একটা ভাড়ার ফ্ল্যাটে, মা মেয়ের-বাবার কাছেও গেল না। শুরু হল ওদের মা-সংসার। শেফালীকে পেল রীতির দেখাশোনার জন্য।ডিভোর্স হয়ে গেল অয়নের সঙ্গে।

দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে একটা গানের জলসায় দেখা অয়নের সাথে, সঙ্গে তার বাবামাও রয়েছে।- বুড়িয়ে যাওয়া অয়নকে দেখে এড়িয়ে যাবে ভেবেছিল সুদীপা, কিন্তু অয়নই এগিয়ে এলো। সে সমৃদ্ধির গানের ভক্ত, তার গান শুনতেই এসেছে। গান শেষে সমৃদ্ধি বাড়ি ফেরার আগে মা সুদীপাকে খুঁজতে আসলে অয়ন অবাক হয়ে সমৃদ্ধির পরিচয় জানলো, শুনে খুশি হলেও যখন বলল তখন সুদীপা বলল "ইস ও যদি ছেলে হত", “এই জন্যই আজও আমাদের দেশের মেয়েরা এগোতে পারেনা কারণ তাদের সম্মুখে এগোনোর প্রধান অন্তরায় তাদের নিজেদের পরিবার।” সবাইয়ের মাথা নিচু।

BANGLADARSHAN.COM

॥পঞ্চানন॥

জ্বর এসেছে জয়তীর, সকালে উঠতে পারলো না, অনিক বৌ ওঠেনি দেখে রান্নাঘরে ঢুকে চা বানিয়েছে, সঙ্গে ডিমসেদ্ধ আর পাউরুটি। চায়ে চুমুক দিয়ে ছেলেমেয়ের দিকে তাকালো, দেখলো তারা ওকেই দেখছে। জয়তীকেও দিল চা, জয়তী মুখে দিয়ে বলল, “আমার মুখে কোনো স্বাদ নেই, আমি চা খাবো না।” অনিক চায়ে চুমুক দিয়ে নিজেই বলল, “এ ম্যা, এমন ন্যাতা ধোয়া জলের মত কেন লাগছে চাটা?” ডিম পাউরুটি ব্রেকফাস্ট ছেলে মেয়েদের দিতে ছেলে আর মেয়ে টপাটপ ডিমগুলো খেয়ে নিল, পাঁউরুটি পড়েই রইলো, জয়তী বলল, “আমি কাঁচা পাঁউরুটি খেতে পারিনা।” বলেই পাশ ফিরে শুলো।

বাসন্তী এলো কাজে, এসে এবাড়ির দাদা অনিকের অবস্থা দেখে ভাতটা করে দিয়ে আর মাছে নুন-হলুদ মাখিয়ে দিয়ে চলে গেল। অনিক ঢুকল মাছ রাঁধতে, কড়াইয়ে তেলে মাছ দিয়ে দিল, কিছুক্ষন পরে খেয়াল হল গ্যাসটা জ্বালেনি। গ্যাস জ্বলল,কিন্তু মাছ তেলে রয়েও কোনো কিছু নেই, উল্টে চড়বড় করছে কেন? অনিক যেই হাতা দিয়ে ওল্টাতে গেল মাছ ফাটতে লাগলো। অনেকক্ষন ধরে গলদঘর্ম হয়ে মাছ পুড়িয়ে ভেজে এবারে ঝোল হবে।

BANGLADARSHAN.COM

বাসন্তীর কাটা আলু, পটল তেলে দিল, হলুদ, লঙ্কা, জিরে, ধনে সব মশলা দিল, ঝোল ফুটছে, কিন্তু একটু কেমন কেমন যেন দেখাচ্ছে, হাতের সামনে ম্যাগির মশলা আর ম্যাজিক মশলা ছিল, সেগুলো দিয়ে দিল। যুদ্ধজয় করেছে এমন মুখ করে দুপুরে খেতে দিল ছেলেমেয়েদের আগে, ছেলেমেয়ে দুজনেই ঝোল মুখে দিয়ে চুপ, জয়তীকে খেতে দিয়ে নিজে বসল খেতে। জয়তী ঝোল দেখে দুচামচ করে ঘি দিল ছেলেমেয়েদের পাতে, নিজেও নিল। অনিককে দিতে গেল, ও বীরবিক্রমে মাছের ঝোল দিয়েই খাবে বলে ঝোলে চুমুক দিল, দিয়ে নিজেই উঠে ঘি নিল পাতে।রাতে কোনোরকমে জ্যাম, পাঁউরুটি আর হরলিক্স খেল সবাই। তিনদিন ধরে কখনো ম্যাগি, কখনো মাংস, কখনো ডিম নিয়ে অনিকের রান্নার প্রহসন চলল। রোজই বাইরে থেকে রোল, দোসা আনতে হল পেট ভরাতে। শেষে দই চিঁড়ে, দুধ মুড়িতে এসে দাঁড়ালো খাবার, ছেলে মেয়েরা তবু সেগুলো খেল, বাবার করা রান্না খাবারের থেকে সেগুলো তবু খাওয়া যায়।

পাঁচ দিন জ্বরের পরে জয়তী রান্নাঘরে ঢুকে দেখলো রান্নাঘরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়ে গেছে মোটামুটি, একদম তোল-মাটি-ঘোল অবস্থা সেখানে। ভাগ্যিস বাসন্তী কামাই করেনি, তাই বাসনগুলো সেরকম নোংরা নয়, কিন্তু রান্নাঘরের মেঝে, সিংক, দেয়ালের দিকে চাওয়া যাচ্ছে না, তেলের আর মসলার ছিটে লেগে সাদা টাইলস বিবর্ণ। সব ঠিকঠাক করে মুছে দুপুরে ডাল, আলুপোস্ত আর মাছভাজা করে দিল কোনোরকমে জয়তী।

খেতে বসে অনিক ছেলেমেয়েদের যেই বলেছে, “দেখ তোর মাকে কেমন ট্রেনিং দিয়েছি, সিম্পল খাবারও কেমন সুন্দর করে বানায় বল!!!”

ছেলেমেয়েরা হোহো করে হেসে উঠে বলল, “হ্যাঁ, তুমিই ট্রেনিং দিয়েছো বটে!!!”

মেয়ে যোগ করল, “তুমি তো নিজের রান্না নিজেই খেতে পারো না, এতো ভালো রান্না করেছো!!!”

অনিক তেড়ে উঠে বলল, “আমি হালুয়া বানাতে পারি।”

ছেলে ফুট কাটলো, “টাইট করে?”

অনিক আত্মবিশ্বাসী গলায় বলল, “আমি একবার কাবাব বানিয়েছিলাম, ভুলে গেছিস?”

মেয়ে বলল, “যার বেশিরভাগটাই কাঁচা রয়ে গেছিল বলে খাওয়া যায়নি আর তুমি দ্বিতীয়বার করার রিস্ক নাও নি।”

অনিক ডিফেন্সে খেলতে চেষ্টা করল জয়তীকে জড়িয়ে, “তোর মাকে জিজ্ঞেস কর আমি টমেটো স্যুপ বানাতে পারি।”

জয়তী আর নিজেকে সামলাতে পারলো না, ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, “বিয়ের পর থেকে শুনেই আসছি, খাওয়ার দুর্ভাগ্য হয় নি। পাপচোখে আর সেই স্যুপ দেখা হল না আমার এজন্মে। উফঃ....জানোতো, পোড়ার মুখে সব ভালো, তোমার ওই আসেদ্ধ, আধপোড়া রান্না পরে এগুলো তাই অমৃত লাগছে। হুঁহ, বেশী বোলো না তো..

‘তুমি যদি পঞ্চানন
তোমার দুঃখের কী কারণ’ হে। ভারী আমার ট্রেনার এলেন!!!”

BANGLADARSHAN.COM

অনিক আর কথা বলতে পারলো না, মুখ নামিয়ে চুপচাপ খেতে লাগলো। মনে মনে স্বীকার করে নিল সত্যিই রান্নাটা ওর একেবারেই আসেনা।

॥সমাপ্ত॥